অপরূপ সর্বনাশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০/এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

উৎসর্গ

নিরঞ্জন হালদারকে

অপরূপ সর্বনাশ

তিনি ধুতির ওপর খদ্দরের লং কোট পরে ছিলেন। তাঁর এখন আটান্ন বছর বয়েস, গত চল্লিশ বছর ধরে তিনি এই একই পোষাক পরে আসছেন। মাঝে বার সাতেক বিদেশ ঘুরে এসেছেন, তখন শীত নিবারণের জন্য উলের পোষাক পরিধান করতে হয়েছিল।

তিনি প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীর এখনো ঋজু, মাথা ভর্তি চুল, সামান্যই পাক ধরেছে। প্রশস্ত কপাল, পুরু লেন্সের চশমা, ঠোঁটের ভঙ্গিতে একটু বক্রতা আছে, যাতে অহংকারীর ভাব আসে, কিন্তু তাঁর হাসিটি এখনো নির্মল। তাঁর নাম সত্যসুন্দর আচার্য। এটা তাঁর আসল নাম নয়, সন্ন্যাসীরা যেমন নাম বদলায় তিনিও তেমনি অনেকদিন আগেই নতুন নাম গ্রহণ করে পূর্বনাম বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর এক পিসীমা এখনো বেঁচে আছেন, একমাত্র তিনিই তাঁকে রাজু বলে ডাকেন।

তিনি গাড়ি থেকে নেমে লিফটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। লিফট তখন ওপরে, আর অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন, ততক্ষণে একজন আদালি পাগলের মতন লিফটের বেল টিপছে। তিনি সটান উঠে এলেন তিন তলায়। তিন চারজন বেয়ারা-আদালি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাঁর কামরার দরজা খুলে দিল সসম্ভ্রমে। কেউ অবশ্য নমস্কার অথবা সেলাম করলো না। তিনি প্রথম দিন এসেই সকলকে ডেকে বারণ করে দিয়েছেন।

তিনি তাঁর চেয়ারে বসে টেবিলে ঢেকে-রাখা জলের গেলাসে চুমুক দিলেন। পকেট থেকে একটা ছোট চামড়ার বাক্স বার করলেন। তাতে চার পাঁচটা চুরুট, একটা বেছে নিয়ে ধরালেন যত্ন করে, প্রথম বার ধোঁয়া ছেড়ে তিনি আপন মনেই বললেন বাঃ।

সত্যসুন্দর আচার্য কেন বাঃ বললেন ? এক একটা চুরুট থাকে, যেটা থেকে কিছুতেই সহজে ধোঁয়া বেরুতে চায় না। যত দামী চুরুটই হোক, তার মধ্যে একটা এ রকম থেকেই যায়। হয়তো চুরুটের সামান্য একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, অথবা কোথাও রয়েছে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র। যাদের চুরুট খাওয়ার অভ্যেস আছে, তারাই শুধু বুঝতে পারবে, এই ধরনের চুরুট ধরাবার পর কি রকম মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অপর পক্ষে চুরুটের প্রথম টানেই সাবলীল ধোঁয়া এলে মেজাজ পরিতৃপ্ত হয়। তিনি কি সেই কারণেই বাঃ বললেন!

কিংবা এমনও হতে পারে, তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কেই পরিতৃপ্ত। কোথাও কোনো গ্লানি নেই। জীবনে কোথাও পরাজিত হননি, তাই নিজেকে শোনালেন ঐ কথাটা। অথবা এমনও হতে পারে, ইদানীং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটু একটু বায়ুর চাপ দেখা দেয়, আজ জল খেয়েও সেই বায়ুর অস্তিত্ব বোধ করলেন না বলে উচ্চারণ করলেন ঐ আনন্দের উক্তি।

মোট কথা, এই বয়েসেও, সত্যসুন্দর প্রায়ই নিজের সঙ্গে কথা বলেন।

চুরুট হাতে নিয়ে তিনি উঠে এলেন জানালার কাছে। তাঁর অফিসের এই ঘরটির অবস্থান খুব ভালো। জানলা দিয়ে দেখা যায় কলকাতার সবচেয়ে সুন্দর জায়গার এক টুকরো দৃশ্য। ইডেন গার্ডেনস, কেল্লার ধারের প্রান্তর, গঙ্গা, কয়েকটি বিদেশী জাহাজ ও অনেকখানি আকাশ।

দিনটি সুন্দর, শীতকালের ঝকঝকে রৌদ্রের দুপুর, অল্প অল্প নরম হাওয়া।

জানলায় কোনো শিক নেই, তিনি বাইরের দিকে একটু ঝুঁকে দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য, পুনরায় বললেন, ওরা বেশ আছে।

কারা ?

গঙ্গার পার্শ্ববর্তী স্ট্যাণ্ডে এই দুপুরবেলাতেও কয়েকজন তরুণ তরুণীকে হাঁটতে দেখা যায়। কয়েকজন বেঞ্চের অনেকখানি

জায়গা রেখে বসেছে খুব পাশাপাশি। তাঁর অফিস ঘর থেকে এই দৃশ্য বেশ দূর তবু মোটামুটি বোঝা যায়। তিনি ঠিক তরুণ তরুণীদের দিকেই তাকিয়ে নেই। আউটট্রাম ঘাটের ঠিক পাশেই বেদে বেদেনীদের কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। বছরের এই সময়টা প্রতি বারই ওরা আসে, নানা জাতের কুকুর বিক্রি করে ওরা। গণ্ডারের খড়্গ এবং বাঘের অণ্ডকোষ নিয়েও নাকি গোপনে কারবার করে এমন শোনা যায়। এখন দুপুরবেলা ঘাঘরা পরা বেদেনীরা ফুটপাথের ওপরেই উনুন জ্বালিয়ে রান্না চাপিয়েছে—খিচুড়িতে এত বেশী হলুদ ঢেলেছে যে গাঢ় হলুদ রং দূর থেকেও বোঝা যায়। নদীর বুকে অনেক ছোট ছোট নৌকো। একটা নৌকোর দু'দিক থেকে দুটি কিশোর ছেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে সাঁতার কেটে আবার ফিরে আসছে। এই রকম খেলায় ওরা অনেকক্ষণ মেতে আছে।

এই সব দৃশ্য কিছুক্ষণ চোখে রেখে তিনি আবার ফিরে এলেন চেয়ারে। এখন কাজে বসবেন।

ভারত সরকার সদ্য যে তৃতীয় ভাষা কমিশন বসিয়েছেন, তাতে সত্যসুন্দর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। এক বছর—দেড় বছরের কাজ। সারা জীবনে তিনি কক্ষনো বাঁধা চাকরি করেন নি, তবে এই ধরনের কাজ নিতে হয়েছে মাঝে মাঝে।

তিনি কয়েকটি ফাইল খুলে রিপোর্ট পড়তে লাগলেন। চশমাটা বদলে কাছে দেখার চশমাটা পরে নিয়েছেন। এখন তাঁর ঠোঁটটি আরও বাঁকা দেখায়, সেই জন্য বেশী অহংকারী মনে হয়। অপরের লেখা যে-কোনো জিনিস পড়তে গেলেই তাঁর ভেতরে এই রকম একটা অবহেলার ভাব আসে।

কয়েক মাস পরেই পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরতে হবে তাঁকে, সাক্ষী নিতে হবে অনেক লোকের। তিনি সেই জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অফিসে এবং বাড়িতেও। তাঁর স্ত্রী লীলা মফঃস্বলে বেড়াতে ভালোবাসে না। সত্যসুন্দরের সঙ্গে তাকে ভারতের

বহু জায়গায় এবং বাইরের নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে, তবু তার মধ্যে ভ্রমণের নেশা ধরেনি। বিশেষত মফঃস্বলে সন্ধের পর যে নির্জন জীবন, তা তার সহ্য হয় না। যদিও, সত্যসুন্দর যেখানেই যাবেন, প্রত্যেক জায়গাতেই সার্কিট হাউসে তাঁর জন্য আগে থেকে রিজার্ভেশন থাকবে, খাওয়া থাকার কোনো অসুবিধে নেই, এবং ইচ্ছে হলেই তিনি সরকারী গাড়িতে যে-কোনো বিখ্যাত দৃশ্য, সংরক্ষিত অরণ্য বা দুর্গম জলপ্রপাত দেখে আসতে পারেন। লীলার ওসবও ভালো লাগে না। লীলা সবচেয়ে অপছন্দ করে অচেনা মানুষ। সত্যসুন্দর যে-কোনো জায়গায় গেলেও বহু লোক আসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের একঘেয়েমিতে লীলা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। লীলার বয়েস সত্যসুন্দরের অর্ধেক—এই ব্যাপারে বাইরের লোকের কৌতূহলের শেষ নেই।

সত্যসুন্দর হুকুম দিয়ে রেখেছেন, লীলাকে যেতেই হবে তার সঙ্গে। লীলা প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু আরও দু' মাস সময় আছে—এতদিন ধরে লীলা সত্যসুন্দরের অনড় আদেশের সঙ্গে যুঝতে পারবে না।

সত্যসুন্দর বেল বাজালেন। আর্দালি এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, প্রবীর চক্রবর্তীকে ডাকো।

তিনি কখনো তাঁর সহকর্মীদের প্রবীরবাবু বা বিমলবাবু বলেন না, আর্দালিদের কাছে বলেন না চক্রবর্তী সাহেব বা সেন সাহেব। তাঁর অনেক রকম বাতিক আছে। এরকম গল্প আছে যে, তিনি একবার কেন্দ্রের এক মন্ত্রীকে হঠাৎ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যে বিষয়ে মানুষ কম জানে, সে বিষয়ে বেশী কথা বলা তার উচিত নয়।

সত্যসুন্দর ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায় গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন। যৌবনে তিনি আফগানিস্তান সীমান্ত ধরে পায়ে হেঁটে রুশ দেশে গিয়েছিলেন। এক সময় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত

সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি জ্ঞানচর্চায় মন দেন। ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের ব্যাপারে তিনি পৃথিবীর প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে একজন। তিনি দুঃসাহসী পুরুষ। তিব্বত ও বেলুচিস্থানে তিনি কয়েকবার বেশ বিপদে পড়েছিলেন, একাধিকবার প্রাণ সংশয় হয়েছিল, রীতিমতন রোমাঞ্চকর জীবন। এক শতাব্দী আগে জন্মালে তিনি অবশ্যই একজন দেশবরেণ্য হতে পারতেন। এ যুগেও, যদি তিনি ধর্মপ্রচার কিংবা রাজনীতিতে নামতেন, তা হলে সাড়া ফেলে দিতে পারতেন অনায়াসে। কিন্তু তিনি ঘোর নাস্তিক এবং মানবতা টানবতা ইত্যাদি বড় বড় কথাকে উপহাস করেন।

আর্দালি এসে জানালো, প্রবীর চক্রবর্তী তখনও লাঞ্চ থেকে ফেরেন নি।

সত্যসুন্দর বললেন, আচ্ছা।

তিনি টেবিলে পাতা ব্লটারের ওপর ছেলেমানুষের মতন লাল পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটতে লাগলেন, তারপর বাংলা ও ইংরেজিতে দু'বার লিখলেন, লাঞ্চ। তিনি ভাবছেন, লাঞ্চ কথাটার কোনো যুৎসই প্রতিশব্দ পাওয়া গেল না। আর খুঁজে লাভ নেই বোধ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন চলবে না, অন্য কোনো খটমটো শব্দের তিনি বিরোধী। তবে, টিফিন কথাটার একটা চমৎকার প্রতিশব্দ ছিল, জল খাবার, কিন্তু সেটাও তো চললো না তেমন। বাড়িতে অনেকে এখনও জল খাবার খায় বটে, কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে কেরানীরা সবাই টিফিন খেয়ে আসে। আর্দালিরাও টিফিন করতে যায়।

সাড়ে তিনটে বাজে, প্রবীর এখনো লাঞ্চ থেকে ফেরেনি, তার মানে সে আর অফিসে নাও আসতে পারে। সত্যসুন্দর তার সমস্ত সহকর্মীদের বলে দিয়েছেন, যে যখন খুশী অফিসে আসতে পারে, যখন খুশী চলে যেতে পারে। তার কাছে কারুর ছুটি চাইবার দরকার নেই। তিনি জোর করে কাজ করানোতে বিশ্বাস

করেন না। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর যার যেটুকু কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। আশানুরূপ অগ্রগতি না দেখলে তিনি এক কথায় ছাঁটাই করে দেন। এটা পুরোপুরি সরকারী অফিস নয়, সব কর্মীই নিযুক্ত হয়েছে অস্থায়ী ভিত্তিতে। সত্যসুন্দর আগে থেকেই শর্ত করে নিয়েছেন, তাঁর নির্দেশের ওপর আর কোনো আমলাতন্ত্রী খবরদারি চলবে না।

প্রবীরকে তিনিই চাকরি দিয়েছেন। ছেলেটি লিঙ্গুইসটিকসে সদ্য ডি ফিল করে বেকার বসেছিল। মাঝে মাঝে আসতো তার বাড়িতে পড়াশুনোর বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য। এ রকম অনেকেই আসে। তবে, প্রবীর আবার লীলার বাপের বাড়ির দিকে কি রকম যেন আত্মীয় হয়, তাই একটু বেশী সুযোগ পেয়েছিল।

সত্যসুন্দর প্রবীরকে বলেছিলেন পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষ একবার ঘুরে আসতে। বই পড়া বিদ্যে যা হবার তা তো হয়েছে। এখন মানুষের সঙ্গে না মিশলে, মানুষের বিভিন্ন রকম ভাষার হের ফের লক্ষ্য না করলে এই বিদ্যা শিক্ষার স্বার্থকতা কি? সত্যসুন্দর নিজেও এই রকম ভাবে শিখেছেন—এগারোটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারেন। এই প্রত্যেকটি ভাষাই, মাতৃভাষার মতন, তিনি আগে কথা বলতে শিখে তারপর ব্যাকরণ জেনেছেন।

প্রবীর এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারে নি। তার পারিবারিক ভরণ পোষণের প্রশ্ন আছে। তাকে চাকরি করতেই হবে।

সত্যসুন্দর বিরক্ত হয়েছিলেন। তবু, লীলার অনুরোধে তিনি প্রবীরকে দিয়েছেন এই চাকরি।

অভাব অভিযোগ এবং দারিদ্র্যের কথা শুনলে তিনি ঘৃণা বোধ করেন। তিনি জানেন, পৃথিবীতে অনেক গরীব লোক আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে তিনি কোনো সম্পর্ক রাখতে চান না। ইতিহাস নিরীক্ষা করে তিনি দেখেছেন, মানুষের মধ্যে বিরাট এক শ্রেণী গরীব থাকবেই। কোনো দেশে খেতে না-পাওয়ার স্তরের পর্যন্ত

গরীব। আর কোনো কোনো দেশে খেতে-পাওয়া গরীব। এ ছাড়া আছে এক সর্বব্যাপী মানসিক দারিদ্র্য। যে মানুষ যে-কোনো উপায়েই হোক এর থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে আসতে না পারে মানুষ হিসেবে সে, সত্যসুন্দরের চোখে নগণ্য।

সত্যসুন্দর এই রকম ভাবেন, তার কারণ তিনি বাল্যকালে ছিলেন বস্তির ছেলে। অন্তত কয়েকটা বছর বস্তিতে কাটিয়েছেন। চুরির দায়ে যে-সময় সত্যসুন্দরের বাবা জেল খাটছিলেন। মিথ্যে অভিযোগ নয়, সত্যিই চুরি করেছিলেন তাঁর বাবা, অফিসের টাকা ভেঙে রেস খেলতেন। সত্যসুন্দরের তখন তের বছর বয়েস, বিপদে পড়ে তাঁর মা তাঁর কাকাদের কাছে গিয়েছিলেন সাহায্য চাইতে৷ কাকারা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এমন অপমান করেছিলেন যে সেই তের বছরের ছেলেই রাগে জ্বলে উঠেছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি কাকাদের বাড়ির দেওয়ালে থুতু ফেলে হীথক্লিফের মতন বলেছিলেন, একদিন এই বাড়ি আমি ভেঙে ফেলবো।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা বিশাল, তার মধ্যে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছিলেন। বস্তিবাসী ছেলের এরকম চমকপ্রদ রেজাল্ট করার ঘটনায় খবরের কাগজের লোকেরা এসেছিল তাঁর ছবি নিতে। কিন্তু এমনই গোঁয়ার ছিলেন সত্য-সুন্দর যে রেজাল্ট বেরুবার পর তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়ে-ছিলেন পর্যন্ত। ফার্স্ট হতে পারেন নি বলে তাঁর আত্মাভিমানে দারুণ আঘাত লেগেছিল। এর পর তিনি নিজের জীবনযাপনের উন্মাদনায় মা ভাইবোন সকলকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। সকলেই মনে করে, তাঁর শরীরে দয়া মায়া কম।

সত্যসুন্দর আবার আপন মনে বললেন এরা আমাকে চেনে না।

তিনি আবার বেল বাজালেন। আর্দালি আসতেই বললেন, বিমল সেনকে ডাকো।

বিমল সেন মোটা-সোটা চেহারার মাঝ বয়সী লোক। অনেক-

কাল অধ্যাপনা করেছেন। খুব বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, জীবনে যা পেয়েছেন, তাতেই পরিতৃপ্ত। টালিগঞ্জে দু' কাঠা জমির ওপর একটা বাড়ি বানাচ্ছেন, অফিসের কাজের চেয়ে সেই বাড়ির চিন্তাতেই তিনি অধিকাংশ সময় মগ্ন থাকেন। তাঁর চারটি ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ায় তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি তো চাকরির বাজারে এলো বলে!

বিমল সেন চেয়ারে বসবার পর সত্যসুন্দর তাঁকে বললেন, কারুর সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে বলেই আপনাকে ডেকেছি। অফিসের কোনো কাজে নয়। আপনার হাতে কি জরুরি কোনো কাজ ছিল?

বিমল সেন বললেন, না, সে রকম কিছু না। ট্রাইব্যালদের রিপোর্টটা তৈরী করছিলাম, কাল করলেও চলবে!

সত্যসুন্দর হেসে বললেন, কাল কেন, পরশু হলেই বা দোষ কি। সবাই জানে, এসব সরকারী কমিশনের আঠারো মাসে বছর। কোনো কমিশনই তো আড়াই বছর তিন বছরের আগে রিপোর্ট দেয় না।

—আমরা দেড় বছরের মধ্যেই সব শেষ করে ফেলতে পারবো!

—সেই রকমই তো কথা দিয়েছি। ইচ্ছে করলে সময় বাড়ানো যায়। সেটাই তো উচিত, কি বলেন!

—না, তেমন কোনো দরকার তো দেখছি না।

—আপনার অসুবিধে নেই। কিন্তু ছেলে ছোকরারা তো আবার বেকার হয়ে পড়বে। প্রবীর, যশপাল, মধা—এরা তো ডেপুটেশানে আসেনি আপনার মতন।

হ্যাঁ, প্রবীর বলছিল ওর একটা পাকা চাকরি বিশেষ দরকার। বাড়িতে অনেক লোকজন।

—তাও তো বিয়ে করে নি।

—ওর বাবা মারা গেলেন গত বছরে, বয়স বেশী হয়নি, আপনার চেয়েও কম বয়েস ছিল।

—ঠিক আছে, আবার তো একটা কমিশন বসবে। তখন আমি তাতে না থাকলেও প্রবীরের নাম সুপারিশ করে দেবো। যদিও আমার মনের ইচ্ছে ছেলেটার ঘাড় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে আসি। সেমেটিকদের ভাষা নিয়ে ওর কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হলো না।

বিমল সেন একটু চুপ করে গেলেন। সত্যসুন্দর আচার্যর এইসব পাগলামির কোনো জবাব দেওয়া যায় না। যার মাথার ওপরে একটা সংসারের দায়িত্ব সে ল্যাঙ্গোয়েজ স্টাডি করার জন্য মিডল ইস্টে যাবে, এটা কি একটা সুস্থ লোকের মতন কথা ?

সত্যসুন্দর বললেন, ছোকরার চেহারাটা তো সুন্দর। সিনেমায় নামার চেষ্টা করলেই পারে। মুখ চোখ ভালো কিন্তু চেহারায় কোনো ব্যক্তিত্ব নেই—এই রকম নায়কই তো সিনেমায়…

—স্যার, আপনি সিনেমা দেখেন ?

—প্রায়ই তো দেখি। বাংলা, হিন্দী। তা ছাড়া, জানেন, আমি নিজেও একবার ফিলমে কাজ করেছিলাম।

– সত্যি ?

—হ্যাঁ। তখন আমার ছাব্বিশ সাতাশ বছর। দিনের বেলা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনো করি, আর সন্ধের পর সোজা সোহো পল্লীর একটা হোটেলে বাসন মেজে দিয়ে দুটো খেতে পাই। আমার খিদেটা বরাবরই বেশী। পেটের জ্বালা নিয়ে কি আর পড়াশুনো করা যায় ? থাকি একটা বাড়ির অ্যাটিকে—সে বাড়িটাতে আবার গিস গিস করে বেশ্যারা, অনেক রাত পর্যন্ত হৈ হল্লা –

বিমল সেন মুখ নীচু করলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং অফিসের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর মুখ থেকে বেশ্যা শব্দটা অনায়াসে বেরিয়ে এলেও তাঁর কানে লাগে। যে-কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালীর মতনই তাঁর নৈতিকতা অতি প্রখর।

সত্যসুন্দর বললেন, এই সময় কিছু উটকো রোজগার হয়ে

গেল। জে আর্থার র‍্যাঙ্ক-এর কম্পানি একটা ঐতিহাসিক ফিলম তুলছিল—ঐতিহাসিক মানে গাঁজাখুরি আর কি—যাই হোক, তাতে ভিড়ের দৃশ্যে শত শত লোক দরকার ছিল—পাড়া থেকে আমাদের অনেকেরই সুযোগ মিলে গেল, দিনে পাঁচ পাউণ্ড। ধরা চূড়ো পরে দৌড়োদৌড়ি করতে হতো। তলোয়ারের ঘা খেয়ে মরে যাওয়ার অভিনয় ছিল আমার। কতবার যে মরলাম। একবার করে মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করে শুয়ে পড়ি—আর ওরা বলে যে, ছবি তোলা ঠিক হয়নি, আবার মরতে হবে। আমি গ্রীক ভাষা জানি, একবার গ্রীক ভাষায় একটা কাতোরোক্তি করেছি বলে পরিচালকের কি রাগ! হা-হা-হা হা—

—ছবিটার নাম কি স্যার?

—সে সব মনে নেই। তবে, সব শুদ্ধ পঞ্চান্ন পাউণ্ড রোজগার হয়েছিল, ভালো খাবার দাবারও দিত—সেই টাকাটা সম্বল করেই কায়রো চলে এসেছিলাম, হিয়েরো গ্লিফিকস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভি-জ্ঞতা নিতে। সেই সময় ডঃ কুনও কায়রোতে, পরিচয় হয়ে গেল—

হঠাৎ থেমে গেলেন সত্যসুন্দর। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দুঃখিত। আমাকে মাপ করবেন।

বিমল সেন সচকিত ভাবে মুখ তুলে তাকালেন। দু' চোখে প্রশ্ন।

সত্যসুন্দর বললেন, আমি খুব দুঃখিত। নিজের জীবন কাহিনী জোর করে অপরকে শোনানো একটা খারাপ ব্যাধি। বার্ধক্যে এই রকম ব্যাধি বেশী দেখা দেয়। আমার আগে এ রকম ছিল না—

বিমল সেন প্রতিবাদ করে বললেন, না, স্যার, দারুণ ইন্টা-রেস্টিং লাগছিল। আপনার জীবনে এত সব অভিজ্ঞতা আছে। আপনি এবার একটা আত্মজীবনী লিখুন না।

—আমার জীবনী অন্য লোকে জেনে কি করবে?

—এতকাল ধরে আপনি-যা সঞ্চয় করেছেন, তার ভাগ যাতে

অন্যরা পেতে পারেন। বৃটিশ পণ্ডিতরা অনেকেই আত্মজীবনী লেখেন—আমাদের দেশে এ রকম ট্র্যাডিশন নেই -

—আমার আগ্রহ হয় না।

—আপনি তো বহু দেশ ঘুরেছেন, ছোট ছোট ভ্রমণ কাহিনীর আকারেও যদি লেখেন—টয়েনবী সাহেব যেমন লিখেছেন ফ্রম অক্সাস টু যমুনা—

সত্যসুন্দর আর ও বিষয়ে কোনো কথা বললেন না। প্রসঙ্গ ফিরিয়ে বললেন, এই ঘটনাটার এই জন্য উল্লেখ করলাম যে, পড়াশুনো করতে গেলে যে-কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করা দরকার। অর্থ চিন্তা থাকলে জ্ঞান চর্চা করা যায় না। আর টাকা রোজগারের জন্য চুরি-ডাকাতি ছাড়া যে-কোনো উপায়ই গ্রহণ করা উচিত। আমি তো কিছুদিন ব্যবসাও করেছিলুম।

বিমল সেন জানেন, সত্যসুন্দর রীতিমতন ধনাঢ্য লোক। শুধু বই লিখে এত টাকা হতে পারে না। মানুষটির মধ্যে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠিক যেন শ্রদ্ধা করা যায় না। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এমন ভোগবাদী দর্শন মানায় না যেন ঠিক।

সত্যসুন্দরের একটি মন্তব্যে বিমল সেনের মনের মধ্যে অনেকক্ষণ কুরকুর করছিল। এবার সুযোগ পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, স্যার, আপনি যে বললেন, আর একটা ভাষা কমিশন বসবে, সে রকম কিছু খবর পেয়েছেন?

সত্যসুন্দর এবার হাসলেন। তারপর বললেন, বসবে না? আপনার কি মনে হয়?

—মানে এটা এখনো শেষ হলো না। এর মধ্যেই আর একটা।

—এই তো এ দেশের নিয়ম। আমাদের এই কমিশনের রিপোর্ট তৈরি হলে, আপনার কি ধারণা, সেটা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হবে? কিংবা সরকার সেটা মানবে? আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করতে গেলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে

আবার ভাষা দাঙ্গা লেগে যাবে। সেটাকে ধামা চাপা দেবার জন্য আবার একটা কমিশন। তাতে আবার অন্তত দু' তিন বছর কাটবে। এই রকমই তো চলে আসছে।

বিমল সেন একটু বিষণ্ণ ভাবে বললেন, কোনো ফল হবে না জেনেও আমরা তা হলে এ কাজ করছি কেন?

—আপনি মন খারাপ করছেন নাকি? উঁহুঃ, এটা ঠিক নয়। গীতায় তো একটা মোক্ষম বাণী ঝেড়ে দিয়ে গেছে, কর্মেই আপনার অধিকার, ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

—এটা খুব সংকীর্ণ অর্থ করা হলো না?

—আপনার মনমতন বৃহৎ অর্থ করে নিন্। মোট কথা, আত্মগ্লানি ভালো নয়। আগে থেকে বিবেক পরিষ্কার রাখাই সুবিধাজনক। আমি এই বুঝি যে জ্ঞান চর্চা শুধু নিজের বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য। এর সঙ্গে জীবিকা বা অন্ন সংস্থানের ব্যাপার জড়িয়ে ফেললে কিছু কিছু নীচতার আশ্রয় নিতে হবেই। দেখেন না, কত লোক সরস্বতীকে নিয়ে বানরীর মতন নাচিয়ে বেড়ায়।

এই রকম একটা বিদ্যাসাগর মশাইও বলেছিলেন বটে, তবু বিমল সেনের ঈষৎ সংস্কারগ্রস্ত মনে এই প্রকার উৎপ্রেক্ষা একটা ধাক্কা দেয়। তিনি উঠে পড়বার জন্য উসখুস করেন।

সত্যসুন্দর তখনও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন বলে একটা কিছু বলতেই হয়। প্রায় কিছু না ভেবেই তিনি তা বলে ফেললেন, স্যার, আপনার মতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সত্যসুন্দরের ঠোঁটটা আবার বেঁকে গেল। অর্থাৎ এটা একটা খুব বাজে প্রশ্ন। সামান্য লোকেরাই এই ধরনের কথা বলে।

তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, আনন্দ। যে-রকম ভাবে আনন্দ পায়।

—আপনি তা পেয়েছেন?

—হ্যাঁ পেয়েছি। একটা কুলি আনন্দ পায় সন্ধের পর গঙ্গার ধারে বসে গাঁজা টেনে, আর আমি আনন্দ পাই অন্য গ্রন্থকারের

যুক্তি খণ্ডন করে। তবে, আনন্দের তো শেষ নেই। বাকি জীবনটাও সেই আনন্দেরই অনুসন্ধান করে যাবো।

—তা হলে যারা ডাকাতি করে কিংবা মানুষ খুন করে।

—হ্যাঁ। তাদের যতক্ষণ না কেউ অন্য আনন্দের সন্ধান দিচ্ছে, তারা ঐ নিয়ে থাকবেই। চিরকালই এ রকম দেখা গেছে। তবে, ডাকাতও সন্ন্যাসী হয় এক সময়—এ রকম উদাহরণও কি নেই?

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠায় আলোচনা আর এগুলো না। বিমল সেন এই সুযোগে উঠে পড়লেন।

সত্যসুন্দরের নির্দেশ দেওয়া আছে যে, বিশেষ জরুরি ব্যাপার না হলে অপারেটার যেন তাঁর ঘরে টেলিফোন না বাজায়।

টেলিফোন করেছে সত্যসুন্দরের স্ত্রী লীলা।

সত্যসুন্দর কণ্ঠস্বর মধুর করে প্রশ্ন করলেন, কি, এতক্ষণে দিবা নিদ্রা ভাঙলো?

লীলা ঃ আজ দুপুরে ঘুমোই নি। সারা দুপুর জেগে আজ শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' বইখানা পড়লাম। আগে পড়িনি তো।

সত্যসুন্দর ঃ শরৎবাবুর সৌভাগ্য। কেমন লাগলো।

লীলা ঃ একদম বাজে। শুধু বকবকানি।

সত্যসুন্দর ঃ তোমার বিচারবুদ্ধির ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।

লীলা ঃ এই, তুমি আজ কখন ফিরবে বাড়িতে?

সত্যসুন্দর ঃ যথারীতি সাড়ে ছ'টায়।

লীলা ঃ সাড়ে পাঁচটা কি পৌনে ছ' টায় আসতে পারো না?

সত্যসুন্দর ঃ কেন?

লীলা ঃ থিয়েটার দেখতে যাবো ভাবছি। 'রাজা অয়দিপাউস' নাকি খুব ভালো হয়েছে। তোমারও ভালো লাগবে।

সত্যসুন্দর ঃ আজ অন্য কোনো সঙ্গী জুটলো না?

লীলা ঃ কাকে আর পাবো। তুমি চলো, লক্ষ্মীটি। তোমার ভালো লাগবে, গিয়েই দেখো না।

সত্যসুন্দর : ভালো লাগার জন্য কষ্ট করে থিয়েটার হল্ পর্যন্ত যেতে হবে কেন? নাটকখানা বাড়িতে বসে পড়লেই তো একই আনন্দ পাওয়া যায়। আমি পাই।

লীলা : ধ্যাৎ! যাবে কিনা বলো।

সত্যসুন্দর : আচ্ছা, আমি বাড়িতে যাচ্ছি। তারপর মনস্থির করবো। সত্যসুন্দর টেলিফোন রেখে দিয়ে আবার চুরুট ধরালেন।

আটশ ঊনত্রিশ বছরের কোনো নারী বা পুরুষ আটান্ন বছরের কোনো রাসভারী ব্যক্তিকে তুমি সম্বোধন করে এমন চটুলভাবে কথা বলে না। নিজের স্ত্রী হলে আলাদা কথা। লীলা আবার সত্যসুন্দরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

সত্যসুন্দর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আপন মনে বিড় বিড় করে বললেন, সকলের আনন্দ এক রকম নয়।

॥ ২ ॥

সত্যসুন্দর প্রথম বিয়ে করেন আটত্রিশ বছর বয়েসে। সে ছিল একটি জার্মান যুবতী। দৈত্য পত্নীর মতন চেহারা—সত্য-সুন্দরের সঙ্গে বেশ মানিয়েছিল। তবু বিয়েটা তিন বছরের বেশী টিঁকলো না। চার বছরের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ওলগা তার পরেও আরও দু'বার বিয়ে করেছে। সব মিলিয়ে এখন তার তিনটি সন্তান, তার মধ্যে একটিও সত্যসুন্দরের নয়। ওলগা এখনো সত্যসুন্দরকে ডার্লিং সম্বোধন করে চিঠি লেখে।

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল লীলা পরাঞ্জপে। মারাঠী মেয়ে, ছোট্টখাট্টো চেহারা, দারুণ বুদ্ধিমতী এবং স্নেহ পরায়ণা। লীলা পরাঞ্জপে হয়ে উঠেছিল সত্যসুন্দরের যোগ্য সহধর্মিনী। স্বামীর কাজে সব রকম সাহায্য করতে পারতো সে, আবার তাঁর সব রকম পাগলামিও মেনে নিত। সত্যসুন্দরের শারীরিক কামনা-বাসনা অত্যন্ত প্রবল।

আপাতপক্ষে সত্যসুন্দরকে বেশ স্বার্থপর মনে হয়। নিজের ভালো লাগার ওপর তিনি বড় বেশী জোর দেন, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে প্রায় অন্ধ, নিজেকে বাদ দিয়ে বাকি জগৎসংসার সম্পর্কে তাঁর একটা পরিহাসমিশ্রিত নির্দিষ্ট ধারণা আছে। তিনি নিজে কারুর কাছে যেমন কখনো কৃপা চাইতে যান নি, তেমনি তাঁর কাছে কেউ দয়া দাক্ষিণ্য চাইতে এলে তিনি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। তবে, তিনি সজ্ঞানে অন্তত অন্য কারুর কোনো কাজে বাধার সৃষ্টি করেন না।

সত্যসুন্দর দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত জিতেছেন, এখন তাঁর ইচ্ছে মতন জীবনযাপন করার সুযোগ আছে—কিন্তু এটা যে প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম নয়, একটা ব্যতিক্রম মাত্র, এটা কিছুতেই মানতে চাইবেন না। যারা নিজস্ব পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, তাদের তিনি করুণা করেন।

লীলা পরাঞ্জপেও ছিল সাধারণ ঘরের মেয়ে। তবু বহু রকম সংস্কার কাটিয়ে উঠে সে সত্যসুন্দরের মন জয় করতে পেরেছিল।

সত্যসুন্দর বাচ্চা ছেলে মেয়ে পছন্দ করতেন না আগে। বাচ্চা কাচ্চার ঝামেলা নিয়ে সংসার করা তাঁর মতন লোককে মানায় না। কিন্তু লীলা একটি সন্তান চেয়েছিল। সেই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই লীলা মারা যায়। তখন লীলার বয়েস সাঁইত্রিশ বছর—ঐ বয়েসে প্রথম সন্তান হলে একটু বিপদের ঝুঁকি থাকেই। লীলার মৃত্যুতে সত্যিকারের আঘাত পেয়েছিলেন সত্যসুন্দর। বাচ্চাটা বেঁচে ছিল আরও পাঁচদিন। তারপর থেকে অন্যের বাচ্চাদের দেখলে সত্যসুন্দরের হাত আদর করার জন্য এগিয়ে যায়।

বাহান্ন বছর বয়েসে তিনি তৃতীয়বার বিয়ে করলেন। এই মেয়েটির নাম আগে ছিল সবিতা। তিনি নাম বদলে লীলা রেখেছেন। প্রথমত, মেয়েদের নাম হিসেবে সবিতা—তাঁর কাছে

একটা অসহ্য ব্যাপার। তাছাড়া, তাঁর আগের স্ত্রী লীলার স্মৃতিকে তিনি টিকিয়ে রেখেছেন এই ভাবে। এর নাম অন্য কিছু রাখলে তিনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে একে ভুল করে লীলা বলে ডেকে ফেলতেন।

লীলা বাঙালী হলেও উত্তরপ্রদেশে মানুষ। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে খুব বেশী যোগ নেই। সত্যসুন্দর লক্ষ্মৌতে উত্তর প্রদেশ সরকারের হয়ে আর একটা কাজ করছিলেন যখন, সেই সময় লীলা তাঁর কাছে চাকরি করতে আসে। সরল সাদাসিধে মেয়ে, খানিকটা অসহায়। চেহারা বেশ সুশ্রী। হঠাৎ পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওদের অনেকগুলো ছোট ছোট ভাই বোন।

লীলা অর্থাৎ সবিতা কাজকর্ম কিছুই জানতো না, সামান্য দু' ছত্র ইংরেজি লিখতে গেলেও তিনটে বানান ভুল। সত্যসুন্দরের বিবেচনায় তাকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত।

সত্যসুন্দর একদিন তাকে নিজের কামরায় ডেকে সোজাসুজি বলেছিলেন, তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না। তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি, মন দিয়ে শুনে দু' দিন পরে উত্তর দিও। তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারো। আমার বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সংসারের ভার তোমাকেই নিতে হবে। দু তিনজন দাস-দাসী আছে, তারা তোমার হুকুম শুনবে। তোমার বিলাসিতার জন্য ভালো হাত খরচ পাবে। তোমার কোনো কিছুই অভাব থাকবে না। আমি তোমার জন্য শিক্ষক রেখে দেবো—তার কাছে পড়াশুনো করবে। এতে তুমি রাজি কিনা ভেবে দেখো নিজে। আগেই বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করার কোনো দরকার নেই।

অপমানে লজ্জায় লীলা ঘাড় হেঁট করে ছিল। মুখখানা টকটকে লাল। সত্যসুন্দর যা বললেন, তার একটাই অর্থ হয়। তিনি মেয়েটিকে রক্ষিতা রাখতে চাইছেন। সাধারণ ঘরের মেয়েরা বরং অসহায় অবস্থায় পড়লে আত্মহত্যা করে কিন্তু প্রকাশ্যে অসতী

হতে চায় না। তা ছাড়া, পারিবারিক বন্ধন এমন তীব্র যে বাবা-পরের মনে কষ্ট দেবার কথা ভেবেই তারা অনেক সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিতে পারে অনায়াসে।

সত্যসুন্দর এটা একটু বাদে বুঝতে পেরে দ্রুত সংশোধন করে নিলেন নিজেকে। বললেন, অর্থাৎ আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। সম্মানিত ব্যক্তি সত্যসুন্দর আচার্য তাঁর চেয়ে তিরিশ বছরের ছোট একটি মেয়েকে বিয়ে করছেন, এর চেয়ে সরস আলোচনার বিষয় আর কি হতে পারে। কিন্তু আলোচনা ও টিকা টিপ্পনির স্তরেই সেটা নিবদ্ধ থাকে—কারণ, যেহেতু বিয়ে, তাতে বাধা দেবার উপায় নেই কোনো।

সত্যসুন্দর কিছুই গ্রাহ্য করেন নি। বয়েসের প্রশ্নটা খুবই অবান্তর তাঁর কাছে। যৌবনকে খুব বেশী সম্মান দেবার কোনো অর্থ থাকে না। যৌবনে বুদ্ধি অপরিণত থাকে। তিনি তো হাজার হাজার যুবককে দেখছেন। সাধারণ একটা বিচারবুদ্ধি পর্যন্ত নেই। আর শারীরিক দিক থেকেও তিনি যুবকদের থেকে কম কিসে ?

সেই বাহান্ন বছর বয়েসেও তাঁর স্বাস্থ্য অটুট। কোনো রোগ ব্যাধি নেই। সিঁড়ি ভেঙে অনায়াসে পাঁচ ছ' তলা উঠতে পারেন, পরিশ্রম করতে পারেন অসুরের মতন। তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা লড়লে বহু যুবক হেরে যাবে। তাঁর যৌন ক্ষমতাও আগেরই মতন আছে। একমাত্র একটা কথা উঠতে পারে, কোনো যুবক স্বামীর তুলনায় সত্যসুন্দরের আগে মৃত্যু হতে পারে। তা হোক না। তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থান রেখে যাবেন। তাছাড়া, দেশে বিধবা বিবাহ আইন চালু আছে। লীলা স্বচ্ছন্দে আবার বিয়ে করতে পারে, তেমন কিছু হলে।

নারীহীন গৃহ সত্যসুন্দর সহ্য করতে পারেন না। শুধু

চাকর-বাকর-ঠাকুর নিয়ে পুরুষশাসিত সংসারে থাকলে স্বভাব রুক্ষ হয়ে যায়। সত্যসুন্দর মাঝে মাঝে নারীসঙ্গ কামনা করেন। পড়াশুনো করতে করতে এক এক সময়ে মাথার মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন নারীর স্পর্শে অপরূপ শান্তি পাওয়া যায়।

এই বয়েসে বিয়ে করার বদলে সঙ্গিনী হিসেবে কোনো নারী পেলেও তাঁর চলতো। কিন্তু এদেশে বিবাহ বন্ধনহীন অবস্থায় কোনো নারীর সঙ্গে একত্রে বাস করার রেওয়াজ আজকাল আর নেই। গত শতাব্দীতে ছিল, ইওরোপে এখন এটা খুবই স্বাভাবিক। যাই হোক, সত্যসুন্দর তো আর সমাজ সংস্কার করতে চান না, তাই তিনি বিয়েই করতে রাজি ছিলেন।

দু'দিন বাদে লীলা এসেছিল তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। লীলার বাবা তো কৃতার্থ একেবারে। বিয়ে হয়েছিল খুব অনাড়ম্বরভাবে। সত্যসুন্দর চেয়েছিলেন লীলার বাপের বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে। পুরোপুরি সক্ষম হন নি। এখনো সেখান থেকে হঠাৎ হঠাৎ কেউ এসে উদয় হয়।

লীলা প্রথম প্রথম সত্যসুন্দরের কাছে আড়ষ্ট হয়ে থাকতো। অচেনা স্বামীকে চিনে নিতেই সময় লাগে। আর কিছুদিন আগেই যিনি ছিলেন তার অফিসের বড় কর্তা, হঠাৎ তাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ায় মানিয়ে নিতে তো সময় লাগবেই।

সত্যসুন্দর লীলার ভয় ভাঙাবার জন্য কতরকম যে ছেলেমানুষী করেছেন, তার ঠিক নেই। তিনি তো শুধু নারীমাংস চাননি, চেয়েছিলেন একজন কোমল সঙ্গিনী। স্ত্রীর সামনে তিনি একেবারে শিশুর মতন হয়ে যেতেও রাজি। যুবক স্বামীদের মতন তিনি লীলাকে নিয়ে সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন। হানিমুন করতে গেছেন সমুদ্রের ধারে। মেয়েদের শাড়ী সম্পর্কে দুর্বলতার কথা জেনে তিনি লীলার শাড়ী গয়না বিষয়ে কোনোরকম

ক্ষোভ রাখার সুযোগ রাখেন নি।

স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখার বাতিকও তাঁর নেই। লীলাকে তিনি যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে যখন খুশী দেখা করতে যেতে পারে। আত্মীয়-অনাত্মীয় যুবকদের সঙ্গে সিনেমায় যায়। তাঁর ছাত্র বা তরুণ সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি সব সময়েই লীলার আলাপ করিয়ে দেন। তিনি জানেন, জল যেমন জলকে টানে, তেমনি যৌবনও যৌবনের দিকে আকর্ষিত হবেই। লীলার যাতে কোনো অভাব বোধ না থাকে, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। লীলার প্রতি এতদিনে তাঁর একটা স্নেহমিশ্রিত মায়া জন্মে গেছে।

লীলাও অনেক বদলে গেছে এখন। স্বামীর প্রতি তার টান অসম্ভব তীব্র। অনেক সময় সে অভিমান করে, ঝগড়া করে, রাগের চোটে জিনিসপত্র ভাঙে—আবার এক সময় সত্যসুন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি আমাকে বকো না কেন? তুমি এত ভালো কেন? আমি মোটেই তোমার যোগ্য নই!

সত্যসুন্দর হাসেন তখন। এই সুন্দর খেলনাটি তাঁকে বড় আনন্দ দেয়।

লীলা খুব একটা রূপসী নয়। গায়ের রং বেশ চাপা, নাক চোখেও খুব বিশেষত্ব নেই, কিন্তু তার স্বাস্থ্যটি চমৎকার এবং প্রাণচাঞ্চল্য আছে।

সত্যসুন্দর বছরের বেশীর ভাগ সময়ই কাটান দিল্লিতে। কলকাতা বা পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে তার বিশেষ কোনো আলাদা টান নেই। তিনি এত বেশী সময় বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন যে, যে-কোনো জায়গাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তবে কলকাতায় তার একটা বাড়ি আছে।

নিউ আলিপুরে অল্প জমির ওপরে তিনতলা বাড়ি। এক তলাতে বসবার ঘর, রান্না ঘর এবং পিসীমার ঘর। সত্যসুন্দরের

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সব মরে ঝরে গেছে, তিনি কারুর সম্পর্কে মাথাও ঘামান না—কিন্তু এই পিসীমাটিকে ফেলতে পারেননি। ইনি খুঁজে খুঁজে দিল্লীতে গিয়েই সত্যসুন্দরকে খুঁজে বার করেছিলেন। দোতলায় চারখানি ঘর, তার মধ্যে একটি লীলার, বাকিগুলো বইপত্রে ঠাসা। তিনতলায় একটি মাত্র ঘর, সেটা সত্যসুন্দরের নিজস্ব। অধিকাংশ সময় তিনি এই ঘরেই কাটান। তাঁর শোওয়ার খাটও এখানেই। প্রথমবার জার্মান রমণীকে বিয়ে করার পর থেকেই তিনি স্বামী স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক তো কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এটা আনন্দের ব্যাপার। আনন্দেরও বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত আছে। কখনো তিনি লীলাকে এ ঘরে ডেকে আনেন। কখনো লীলা নিজে থেকেই মাঝরাতে ওপরে উঠে এসে বলে, আজ আমার ভয় করছে।

বাইরের লোক খুব কমই একতলা ছেড়ে দোতলা তিনতলায় ওঠে। গণ্যমান্য লোকেরা এলেও সত্যসুন্দর তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্তার জন্য বেশী সময় খরচ করেন না। তবে লীলার বন্ধু-বান্ধবরা তার সঙ্গে ওপরে এসেই কথা বলে। সত্যসুন্দরের প্রিয় শিষ্য বা ছাত্র বা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কেউ কেউ আসে তিনতলার ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। যেমন আসে প্রবীর।

লীলা লক্ষ্ণৌয়ের মেয়ে। খুব অল্প বয়েসে একবার মাত্র কলকাতা এসেছিল। তখন কলকাতা ছিল তারচোখে একটা স্বপ্নের স্বর্গপুরী। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে দু'তিনবার কলকাতায় এসেও তার সেই ধারণা বদলায় নি। এই নোংরা, ভিড়ে ভর্তি শহরটাকে সে ভালোবেসে ফেললো। তা ছাড়া এখানে আছে তাদের নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ির প্রতি মেয়েদের সাংঘাতিক টান থাকেই। নিজেদের এমন সুন্দর বাড়ি ফেলে দিল্লিদিল্লি থাক-বার কোনো মানে হয়? সেইজন্যই একবার কলকাতায় এলে সে আর সহজে বাইরে যেতে চায় না।

বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে লীলার তেমন কোনো যোগাযোগ

ছিল না। কলকাতায় আসবার পর সে পড়তে শুরু করেছে বাংলা বইপত্র, বাংলা সিনেমা ও নাটক—সবই তার দেখা চাই। সত্যসুন্দরের বাংলা ভাষা-প্রীতি থাকলেও তাঁর রুচি বোধ তাঁকে এইসব সিনেমা ও থিয়েটার সম্পর্কে বিমুখ করে। তবু লীলার কোনো সঙ্গী না থাকলে তিনি অগত্যা যান তার সঙ্গে।

লীলা অবশ্য প্রায়ই সঙ্গী পেয়ে যায়। এখানে এসে সে তার যত রাজ্যের দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে বার করেছে। একজন দুজনকে পাওয়া গেলেই সেই সূত্রে বাকিরাও আসে। লীলা তাদের বাড়িতে প্রায়ই ডেকে আনে, নেমন্তন্ন খাওয়া, হৈ চৈ করে সিনেমায় যায়।

সত্যসুন্দর যে এরকম ভীড় পছন্দ করেন না, তা লীলা জানে। তবু সে গ্রাহ্য করে নি। সত্যসুন্দরও শুধু মৃদু আপত্তি জানিয়েছেন, বাধা দেননি তেমনভাবে।

সত্যসুন্দর ঠিকই করে রেখেছেন, এই কমিশনের কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার কলকাতার পাট তুলে দেবেন। লীলাকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়বেন আবার। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বছর দু'য়েক কাটাবেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধুরা যে হিমালয়ে এসে আশ্রয় নেয়, তাদের মধ্যে প্রাদেশিকতা আছে কিনা —সেটা অনুসন্ধান করে দেখার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। এদের যোগাযোগের মাধ্যম কিভাবে গড়ে ওঠে, এদের খাদ্যাভাস কিভাবে গড়ে ওঠে, এদের খাদ্যাভাস কিভাবে বদলায়, তা জানা দরকার। এই বিষয়ে বিশেষ কোনো কাজই হয়নি।

প্রত্যেকদিন অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসেন সত্যসুন্দর। সরকার থেকে তাঁকে একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। গাড়িখানা চব্বিশ ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য।

বাড়ি ফিরে তিনি একতলায় তাঁর পিসীমার খবর নেন একবার। বৃদ্ধার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই তিনি সত্যসুন্দরের গায়ে হাত বুলিয়ে কথা বলেন। সেই লোলচর্ম

বৃদ্ধার হাতের স্পর্শে বহুদিনের পুরোনো স্নেহ লেগে আছে। তিনি হাত বুলোতে বুলোতে বলেন হ্যাঁ রে রাজু, শরীরের যত্ন নিস তো ঠিক মতন? বাবাঃ, যা মাথার কাজ করতে হয় তোকে। বৌমাকে বলিস, যেন রোজ থানকুনি পাতার রস করে দেয় তোকে।

লীলা এই পিসীকে দেখতে পারে না। কোনো খোঁজ খবরও নেয় না। পিসী কিন্তু কোনদিনই লীলা সম্পর্কে একটি অভিযোগও করেননি।

সত্যসুন্দর দোতলায় উঠে এসে উঁকি মারেন লীলার ঘরে। সত্যসুন্দর অফিস থেকে ফেরার আগেই লীলা গা ধুয়ে সেজেগুজে থাকে। ভুরুতে কাজল, শাড়ীর সঙ্গে রং মেলানো টিপ আঁকা কপালে।

স্বামীকে দেখে লীলা জানলার ধারের চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে। তাদের জানলা দিয়ে অদূরে একটা ফুটবল মাঠ দেখা যায়, সেখানে গায়ে ধুলো কাদা মাখা যুবকেরা ফুটবল নিয়ে লড়াই করে প্রত্যেক বিকেলে। রোজ সেই খেলা দেখতে দেখতে লীলা ফুটবল খেলার ভক্ত হয়ে গেছে রীতিমতন।

সত্যসুন্দর স্ত্রীর গালে একটা টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি লীলাময়ী, আজ কি প্রোগ্রাম?

লীলা প্রত্যেকদিন নতুন নতুন প্রোগ্রাম বানায়। সন্ধ্যেবেলা সে বাইরে বেরুবেই। বিকেলবেলা সে ঘরের মধ্যে খাঁচায় ভরা একটা সুন্দর পাখির মতন ছটফট করে। চলতি সিনেমা-থিয়েটার নিঃশেষ হয়ে গেলেও সে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে গানের জলসা, ম্যাজিক শো ইত্যাদি যা হোক কিছু খুঁজে বার করে। এসবের জন্য সে অন্য সঙ্গী খুঁজে নেয়। এসব কিছু না থাকলে সে সত্যসুন্দরকে নিয়েই বেড়াতে বেরোয়।

গঙ্গার ধারে কিংবা বালীগঞ্জের লেকে যেতে সত্যসুন্দরের মন্দ লাগে না। টাটকা হাওয়ার একটা আলাদা স্বাদ আছেই। ঐ

সব জায়গায় বহু অল্প বয়েসী যুবক যুবতীদের দেখতে পাওয়া যায়, মনে হয় কত লঘু তাদের জীবন। ঐ রকম বয়েসে সত্যসুন্দর একদিনের জন্যও বিরাম পাননি।

লীলা যেদিন অন্যদের সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটারে যায়, সেদিন তিনি উঠে আসেন তিনতলায় তাঁর নিজের ঘরে। তাঁর ঘরের সঙ্গেই বাথরুম আছে। স্নান করার আগে তিনি কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে নেন। সকালে ও সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। একমাত্র চোখ ছাড়া শরীরের আর কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাঁর কোনো খুঁত নেই।

স্নান সেরে জামা কাপড় বদলে তিনি আরাম কেদারায় বসেন। এখানে জানলা দিয়ে বহুদূর দেখা যায়। খুব একটা সুন্দর দৃশ্য কিছু নয়। বড় বড় ঝকঝকে নতুন বাড়ির ধার ঘেঁষেই পুরোনো বস্তি। রাস্তায় যখন তখন ট্র্যাফিক জ্যাম। বই খুলে বসলেই সত্যসুন্দরের ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে কেটে যায়। মাঝে মাঝে তিনি নিজের মনে বিড়বিড় করেন। রাত দশটার সময় লীলা নিজে তাঁকে ডাকতে আসে খাবার খেতে যাওয়ার জন্য।

একদিন রাত ন'টা আন্দাজ সত্যসুন্দরের মাথার মধ্যে হঠাৎ চিনচিন করে উঠলো। নিজের ঘরেই তিনি বই নিয়ে বসেছিলেন। এই প্রকার অনুভূতিতে একটু বিরক্ত হলেন। ক'দিন ধরেই মাথার মধ্যে এরকম চিনচিন করে উঠছে মাঝে মাঝে। এ ছাড়া সর্বক্ষণ একটা মাথা ধরার ভাব। সারা জীবনে সত্যসুন্দর অসুখ টসুখে এত কম ভুগেছেন যে, সামান্য কিছু হলেই তিনি নিজের ওপর রেগে যান। যেন এটা তাঁর অক্ষমতা।

চোখের জন্য মাথা ধরার ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। সত্যসুন্দর ভাবলেন চশমার পাওয়ার আবার বাড়াতে হবে। এই এক ঝামেলা। যাই হোক, আপাতত মাথা-ধরার একটা কিছু ওষুধ এখন খাওয়া দরকার।

সত্যসুন্দর নিজের ঘরে ওষুধ পত্তর কিছুই রাখেন না।

লীলার ঘরে পাওয়া যেতে পারে। ন'টা বেজে গেছে, লীলা এতক্ষণে সিনেমা দেখে ফিরেছে কি!

সত্যসুন্দর নেমে এলেন নীচে, লীলার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। স্বামী কখনও স্ত্রীর ঘরে ঢোকার আগে শব্দ করে জানান দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

সত্যসুন্দর দরজা ঠেলে এক পা বাড়িয়ে থেমে গেলেন।

লীলার বুক থেকে শাড়ীর আঁচল খসে গেছে। তার নগ্ন কোমরে প্রবীরের হাত। লীলার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, চোখ জ্বলজ্বলে, সে প্রবীরের বুকে মাথা হেলান দিয়ে আছে। তারপর বোঝা যায় সে কাঁদছে একটু একটু। প্রবীরের বুকে ছোট ছোট কিল মেরে সে বলছে, কেন? কেন? কেন?

সত্যসুন্দর স্থানু হয়ে গেলেন। তাঁর গলা দিয়ে একটু স্বরও বেরুলো না। ওরা দু'জনে তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার পরও তিনি সরে যেতে পারলেন না। তাঁর যেরকম শারীরিক শক্তি তাতে ক্রোধের বশে তিনি এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতেন। তিনি কিছু করলেন না।

বরং তাঁর মনে হলো, গলার কাছে তাঁর কোটের বোতামটা এক্ষুনি না খুলে ফেললে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবে এক্ষুনি। বোতাম খোলার জন্য তিনি হাত তুলতে চাইলেন। পারলেন না। তিনি অসহায়ভাবে ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

॥ ৩ ॥

একজন ডাক্তার এসে আরও দুজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। তিনজন ডাক্তার শলাপরামর্শ করলেন অনেকক্ষণ ধরে। সত্যসুন্দরকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যাপারে ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একজন ডাক্তারের মতে সত্যসুন্দরকে তাঁর নিজের বিছানায় শান্তিতে মরতে দেওয়াই ভালো। আর একজন ডাক্তারের মতে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই সত্যসুন্দরের মৃত্যু হলে দায়ী

কে হবে ? তৃতীয়জন জেদ করতে লাগলেন।

জ্যান্ত অবস্থাতেই পি জি হাসপাতালে পেঁাছোলেন সত্যসুন্দর। সবাইকে অবাক করে তারপরেও দিনের পর দিন বেঁচে রইলেন। এক সপ্তাহ পরে তাঁর সাময়িক ভাবে জীবন সংশয়ও কেটে গেল।

সত্যসুন্দরের সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। বাকশক্তিও নেই। কিন্তু মস্তিষ্ক ঠিক আছে। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু দেখেন, সব বুঝতে পারেন কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। সামান্য অঙ্গুলি হেলনের ক্ষমতাও তাঁর নেই।

দশদিন পর দেখা গেল, সত্যসুন্দর সামান্য ঠোঁট নাড়তে পারছেন। তার অর্থ কিছুই বোঝা যায় না। তবু নড়ছে যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন সকলেরই আশা হলো, সত্যসুন্দর হয়তো আস্তে আস্তে আবার সব ক্ষমতা ফিরে পাবেন। এরকম হয়। মানসিক জোর থাকলে এটা অসম্ভব কিছু নয়। হঠাৎ দেখা যাবে রোগী একেবারে সুস্থ হয়ে গেছে। আর সত্যসুন্দরের মনের জোরের কথা তো সুবিদিত।

হাসপাতালের পরিবেশ রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নয় বলে একমাস বাদে সত্যসুন্দরকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। স্ট্রেচার বাহকরা তাঁকে নিয়ে এলো দোতলায় লীলার ঘরে। শোওয়ানো হলো লীলার খাটে।

লীলা আর একখানা ঘরের বইপত্র সরিয়ে সেখানাকেও বাস-যোগ্য করে তুললো। একজন নার্স ঠিক করা হয়েছে। তবে আকস্মিক বিপদের আশংকা নেই বলে নার্স রাত্তিরে থাকবে না, শুধু দিনের বেলা।

সত্যসুন্দর অধিকাংশ সময়েই চোখ বুজে থাকেন। কখন ঘুমিয়ে আছেন, আর কখন জেগে, তা বোঝা যায় না। নার্স তাকে ফিডিং কাপে করে খাইয়ে যায়, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে সত্যসুন্দরের গা মুছিয়ে দেয়। সত্যসুন্দর তখনও চোখ বুজে থাকেন।

—স্যার, স্যার।

কুণ্ঠিত ডাক শুনে সত্যসুন্দর চোখ মেলে তাকালেন। প্রবীর তাঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—স্যার, আপনাকে কিছু বলার মুখ নেই আমার। তবু যদি আমাকে একটু সুযোগ দেন, যদি আমি বুঝিয়ে বলি।

সত্যসুন্দর নির্বাক, নিস্পন্দ, স্থির দৃষ্টি।

সত্যসুন্দর ভাবলেন, এখন রাত ক'টা হবে? দশটা? সাড়ে দশটা? নার্স বাড়ি যাবার আগে তাঁকে রাত্রির খাবার খাইয়ে গেছে। সে তো যায় ন'টার সময়। অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। প্রবীর এখনো যায়নি। ও কি রাত্তিরে এখানেই থাকে?

প্রবীরের মুখখানা ভীতিবিহ্বল। অসক্ত, অসহায় সত্য-সুন্দরকেও সে ভয় পাচ্ছে।

প্রবীর বললে, স্যার, আপনি আমাকে কি ভাবছেন, জানি না। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি।

সত্যসুন্দরের যদি হাসার ক্ষমতা থাকতো তো তিনি হাসতেন এই সময়। ভয় পেয়ে ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই ভুলে গেছে সে, সত্যসুন্দর সারাজীবনে কখনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নি। তাই ঈশ্বরের দিব্যির কোনো মূল্যই নেই তাঁর কাছে।

—লীলাদি আমার মাসীমার মেয়ে। আপন মাসী না হলেও ওঁকে আমি ঠিক নিজের দিদির মতনই দেখি।

সত্যসুন্দর ভাবলেন, মানুষ এতো নির্বোধ হয় কি করে? তাঁর অসুখের আগেও প্রবীর লীলাকে বৌদি বলে ডাকতো! আজ হঠাৎ দিদি বলতে শুরু করেছে। ভেবেছে বোধহয়, সত্যসুন্দরের এখন মস্তিষ্ক বিকার—তাই যা খুশী বলে বোঝানো যাবে।

—ওঁর হঠাৎ খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই চিঠি পেয়েছিলেন যে ওর বাবার শরীর খারাপ, খুব কান্নাকাটি কর-ছিলেন।

আঃ, এইসব আজে বাজে কথা বলে কেন যে সময় নষ্ট করছে।

এর চেয়ে অনেক দরকারী কথা জানার দরকার ছিল প্রবীরের কাছে। কমিশনের কাজ কি বন্ধ হয়ে গেছে? কিংবা নতুন চেয়ারম্যান ঠিক করেছে ওরা। ভাষা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সত্যসুন্দরের নাম পার্লামেণ্টে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁকে সরাতে গেলে আইন ঘটিত কিছু গোলমাল দেখা দেবে বোধহয়। সত্যসুন্দরের ক্ষমতা থাকলে তিনি পদত্যাগ পত্র অবশ্যই লিখে দিতেন।

এইসব কথা কিছুই বলে না কেন এরা? সন্ধ্যেবেলা অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। তাঁর মধ্যে একজন আবার মন্ত্রী। নানারকম মন্তব্য করলেন সকলে, কিন্তু কমিশনের কাজের কথা কেউ উচ্চারণ করেন নি। ভেবেছিলেন বোধহয়, এই সময় অফিসের কাজকর্মের কথা শুনলে সত্যসুন্দরের মাথার ওপরে আরও চাপ পড়বে। বাণ্ড অফ ফুলস। বিরক্তিতে সত্যসুন্দর চোখ বন্ধ করেছিলেন তখন।

এখন বুঝতে পারছেন, প্রবীর কেন এত রাত্তির পর্যন্ত এখানে আছে। অন্য সময় বহু লোকজনের ভিড়, প্রবীর একটু নিরালা খুঁজছিল। সে তার মনের ভাব লাঘব করতে চায়।

প্রবীর বললো, আমার মনে কোনো পাপ ছিল না, আপনি বিশ্বাস করুন। লীলাদিও আপনাকে এত বেশী ভক্তি করেন।

এরা কি সত্যসুন্দরকে ঈর্ষাকাতর সাধারণ মানুষ মনে করে? তাঁর স্ত্রী অন্য কার বুকে মাথা রেখেছে কিম্বা চুম্বন করেছে, তাতেই তিনি এ রকম হয়ে পড়বেন? এমন কি ওরা এক বিছানায় শুলেই বা কি যেত আসতো? তিনি জানেন, অমৃত কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। আনন্দ মানুষকে খুঁজে নিতে হয়। সাধারণ মানুষরা নারী সম্পর্কে ঈর্ষা করে আনন্দ পায়। সত্যসুন্দর অসাধারণ।

তা ছাড়া তিনি কি আগেই লক্ষ্য করেন নি লীলা আর প্রবীরের ঘনিষ্ঠতা? ঐ যে এক সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া, পরস্পরের দিকে গাঢ় চোখে তাকানো, নানা ছুতোয় হাত ছোঁওয়া—এর মানে

কি তিনি বোঝেন না ? তিনি সজ্ঞানে এর প্রশ্রয় দিয়েছেন।

লীলাকে আনন্দ দেবার জন্য তিনি কোনো ত্রুটি রাখেননি। নানারকম অলংকার সংগ্রহের মতন সে যদি দু' একটি প্রেমিকও জুটিয়ে নেয়, তাতে আপত্তি করার তো কিছু নেই। তিনি তাঁর নিজের প্রাপ্য ঠিকই পেয়েছেন। লীলার কাছ থেকে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না এখানে।

ডাক্তারদের বা অন্যদের তো কেউ কিছু বলেনি। প্রবীর আর লীলাই শুধু ভাবছে তাদের ঐ ঘনিষ্ঠ দৃশ্যটা দেখে ফেলার জন্যই তিনি এরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্ষমতা থাকলে তিনি চিৎকার করে এর প্রতিবাদ করতেন। এ হতেই পারে না! তাঁর অসুখের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তাঁর মাথার মধ্যে যে চিনচিনে ব্যথাটা ছিল, সেটা আসলে করোনারি অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ এক সঙ্গে ঘটেছে। এই বেচারা দু'জনকে মানসিক গ্লানি থেকে তিনি মুক্তি দিতে চান।

আসলে তিনি তাঁর শরীরের কাছে হেরে গেছেন। মনের জোর দিয়ে তিনি সব কিছু জয় করতে পারতেন, শুধু এই অসুখটাকে থামাতে পারলেন না।

কার পায়ের শব্দ পেলেন। আর একজন কে দাঁড়ালো তাঁর মাথার কাছে। ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না বলে দেখতে পাবেন না। কিন্তু তাঁর শ্রবণ শক্তি এখন অসম্ভব বেড়ে গেছে! অনুভূতিও তীক্ষ্ম হয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন, লীলা এসেছে এবং প্রবীরের সঙ্গে চোখে চোখে কিছু কথা বলে নিচ্ছে।

লীলা এগিয়ে এসে সত্যসুন্দরের পাশে বসে পড়লো। ছলছলে চোখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছো।

সত্যসুন্দর সামান্য ঠোঁট নাড়লেন।

লীলা ব্যগ্রভাবে মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ? কি বলছো ?

প্রবীরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

ওরা কেউ বুঝতে পারলো না সত্যসুন্দর কি বলতে চাইছেন। লীলা বারবার জিজ্ঞেস করছে, আমাকে চিনতে পারছো না?

সত্যসুন্দর ঠোঁট নাড়িয়ে বলতে চাইছেন, না।

এই অবস্থাতেও তাঁর রসবোধ একেবারে মরে যায়নি। দেশ বিদেশে যখনই যেখানে কোনো নারী তাঁকে প্রশ্ন করেছে আমাকে চিনতে পারছেন না?—সত্যসুন্দর সব সময়েই সহাস্যে উত্তর দিয়েছেন, না। মেয়েদের কি কখনো চেনা যায়?

নিজের স্ত্রী সম্পর্কেও তিনি সেই কথাটাই বলতে চান। তাঁর ঠোঁট যে কিভাবে নড়ছে, তিনি তো দেখতে পাচ্ছেন না।

লীলা তাঁর বুকে হাত রাখলো। দেখে মনে হয় এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।

একমাসের বেশী হয়ে গেছে স্বামীর অসুখ। এখনো কি এই জন্য চোখে জল আসে? প্রথম আঘাতটা কেটে যাবার পর তো মন অনেক শক্ত হয়ে যায়। অবশ্য অনেক মেয়ের খুব সহজেই চোখে জল আসে। তবু লীলা, সাবধান, অভিনয় করো না, আমি ঠিক ধরে ফেলবো।

লীলা তাঁর স্বামীর চশমাটা খুলে নেয়নি কেন? চশমাটা খুলে নিলে সত্যসুন্দর খুব কম দেখতে পেতেন, ছোটখাটো ত্রুটি তাঁর চোখে পড়তো না।

লীলা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।

সত্যসুন্দর কিছু বলার চেষ্টাও করলেন না। তিনি এখনো চোখের পলক ফেলতে পারেন ঠিকমত। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যদি একটা চোখের পলকের ভাষা তৈরি করে নিতে পারেন, কেমন হয়? কতবার এবং কত তাড়াতাড়ি চোখের পলক ফেলা হলো, তাই দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো যেতে পারে। এতকাল তিনি ভাষাতত্ত্ব এবং ফোনেটিকস নিয়েমাথা ঘামিয়েছেন—কিন্তু এসব ছাড়াও সারা পৃথিবীতে যে একটা নীরব ভাষা আছে, সে বিষয়ে কখনো খেয়ালই করেননি। প্রেমিক-প্রেমিকারা নীরব ভাষায় কত কি বলে।

লীলা জিজ্ঞেস করলো, চুরুট খাবে ?

প্রবীর বললো, চুরুট খাওয়ার কথা কি ডাক্তাররা বলেছেন !

—ডাক্তারদের সব কথা মেনে চলা যায় না।

—তবু ডাক্তার সেনকে একবার টেলিফোন করবো ?

—কোনো দরকার নেই। উনি চুরুট না খেয়ে এক দণ্ডও থাকতে পারতেন না। ও'র মনে একটু আনন্দ দিতে হলে, এইসব দিতেই হবে।

সত্যসুন্দরের কোনো মতামত দেবার উপায় নেই। এই ক'দিনে তিনি চুরুটের অভাব একবারও বোধ করেন নি। এখন চুরুটের নাম শুনে মনে হচ্ছে, একবার পরীক্ষা করে দেখলে মন্দ হয় না, চুরুট খাওয়ার ক্ষমতাটুকু তাঁর আছে কিনা।

লীলা ওপরের ঘর থেকে চুরুট আনতে গেল। প্রবীর দাঁড়িয়ে রইলো কাচুমাচু হয়ে। লীলা আসার পর প্রবীর একটু সহজ হতে পেরেছিল, একা সত্যসুন্দরের সামনে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

কিন্তু ডাক্তারকে একটা ফোন করার কথা লীলা উড়িয়ে দিল কেন? শারীর বিদ্যা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও নেই লীলার। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর কি সত্যিই চুরুট খাওয়া উচিত? যদি কাশতে গিয়ে নিশ্বাস আটকে যায়! এই চুরুট খেতে গিয়েই যদি মৃত্যু হয় তাঁর ?

লীলা অনায়াসে এই ঝুঁকি নিচ্ছে। প্রবীর আর লীলা যদি পরস্পরকে ভালোবাসে, তাহলে ওরা নিষ্কণ্টক হবার জন্য তো সত্যসুন্দরকে মেরে ফেলতেও পারে ? গল্প-উপন্যাসে এরকম ঘটনা পড়া যায়। আর কিছু না, তাঁর মুখের ওপর একটা বালিশ চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ ঠেসে ধরলেই তো হয়। এরকম রুগীর হঠাৎ মৃত্যু নিয়ে কেউ মাথাঘামাতে যাবে না। সকলেই স্বাভাবিক মনে করবে।

একেবারে বাচ্চা শিশুর মুখে যেরকম চুষিকাঠি পুরে দেওয়া হয়, সেইরকম ভাবে চুরুটটা সত্যসুন্দরের মুখে ঢুকিয়ে দিল লীলা। তারপর দেশলাই জ্বাললো।

সত্যসুন্দর দম বন্ধ করে রইলেন। নিশ্বাস না নিলে চুরুট ধরবে না।

লীলা বললো, ধরছে না কেন ?

প্রবীর বললো, থাক না-হয় !

—তুমি জানো না, উনি চুরুট খেতে ভালোবাসেন, ধরিয়ে দিতে হবে। তুমি ধরিয়ে দেবে ?

—আমি !

—তাতে কি হয়েছে ? দাও।

সত্যসুন্দরের মুখ থেকে চুরুটটা বার করে নিয়ে লীলা সেটা এবার গুঁজে দিল প্রবীরের মুখে। তারপর দেশলাই জেলে প্রবীরের মুখের কাছে আনলো। পরস্পরের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সত্যসুন্দর তৃষিতের মতন চেয়ে রইলেন সেইদিকে। এর নাম নীরব ভাষা। এখন ওদের দু'জনকেই দেখলে বোঝা যায়, ওরা পরস্পরকে কত গভীরভাবে চায়।

চুরুটটা ধরে ওঠার পর লীলা সেটা নিয়ে সত্যসুন্দরের মুখে আবার ভরে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এবার ভালো লাগছে ?

সত্যসুন্দর এখনো আবার দম বন্ধ করে আছেন। চুরুটটা বাইরে ফেলে দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কিন্তু ধোঁয়া ভেতরে ঢোকাবেন না কিছুতেই। চুরুটটা মুখের অনেকখানি ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার ফলে দারুণ অস্বস্তি লাগছে।

একটা ব্যাপারে সত্যসুন্দর নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন। লীলা ধরেই নিয়েছে যে সত্যসুন্দর আর কখনো সুস্থ হয়ে উঠবেন না। তা হলে অপরের এঁটো চুরুট এত সহজে তাঁর মুখে দিত না। লীলা নিজের এঁটো ঠোঁট তাঁকে দিতে পারে, কিন্তু এঁটো চুরুট ? লীলা বুঝে গেছে, এসব ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাবার সাধ্য সত্য-সুন্দরের আর কখনো হবে না। এখন যে কদিন তিনি বেঁচে আছেন, সেই কটা দিন শুধু কাটিয়ে যাওয়া কোনক্রমে।

সত্যসুন্দর এর মধ্যে খুব একটা দোষ দেখতে পেলেন না।

মানুষকে ইতিহাস ও বস্তুবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। নড়াচড়ার ক্ষমতাহীন, বাক্যহীন একজন অথর্ব মানুষ এই সমাজের তার ছাড়া আর কি? অন্য কারুর ব্যক্তিগত জীবনে এই বোঝা আরও বেশী। কতদিন আর ভদ্রভাবে সহ্য করা যায়?

সত্যসুন্দরকেও আর কয়েকদিনের মধ্যে বুঝে যেতে হবে যে সত্যিই তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার আশা আছে কিনা। না হলে তাঁকে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে হবে।

তাহলে লীলা যখনপ্রথম এ ঘরে আসে, তখন তার চোখেজলের আভাস ছিল কেন? সে কি নিজের জন্য কাঁদছিল? আর একটা ব্যাপারও জানা হয়নি। সেই সেদিন লীলা প্রবীরের বুকে কিল মারতে মারতে বলছিল, কেন? কেন? ঐ কেন বলার মানে কি?

প্রবীর বললো, স্যার, আমি যাচ্ছি! আবার কাল সকালেই। সত্যসুন্দর কয়েকবার চোখের পলক ফেললেন। প্রবীর কি এর কিছু মানে বুঝতে পারবে? চেষ্টা করে দেখি।

—লীলাদি, চললাম। দরকার হলে যে-কোনো সময়ে ডাকবেন—

লীলা তখন বিছানার চাদর গুঁজছিল। মুখ না তুলেই বললো, আচ্ছা! প্রবীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই লীলা বললো, আমি এক্ষুনি আসছি!

লীলা বোধ হয় প্রবীরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছে। কিন্তু এত দেরি করছে কেন? কিংবা দেরি করেনি—প্রতিটি মুহূর্তকেই অসম্ভব দীর্ঘ মনে হচ্ছে! এরকম হতেও পারে। এ ঘরের দেয়ালে একটা ঘড়ি রাখলেও পারতো।

চুরুটটা কাৎ হয়ে সত্যসুন্দরের মুখ থেকে পড়ে গেল। তখনও সেটা জ্বলন্ত।

চুরুটটা গড়িয়ে পড়লো সত্যসুন্দরের ঘাড়ের কাছে। একটু সরে এলো, তারপর ডানদিকে বুকের ওপর। সত্যসুন্দরের বুক

ভর্তি বড় বড় লোম, গেঞ্জি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। চুরুটের আগুনে দু'একটা লোম পুড়ে কুঁকড়ে গেল। সত্যসুন্দর বুকের চামড়াতেও ঈষৎ আঁচ অনুভব করছেন। এতে তিনি ভয় পাবার বদলে উৎফুল্ল হলেন একটু। এই ভাবে যদি তার শরীরের সাড় ফিরে আসে।

সমস্ত বিশ্বকে ধ্বংস করে ফেলার মতন মানসিক শক্তি নিয়ে সত্যসুন্দর চাইলেন তাঁর ডান হাতখানা উঁচু করতে। পারলেন না। একটা আঙুলও নড়লো না। তখন তিনি চাইলেন, তাঁর বুকটা পুড়ে একটা গোল ফুটো হয়ে যাক্!

লীলা ফিরে এসে চুরুটটা সেই অবস্থায় দেখে আঁতকে উঠলো। দৌড়ে এসে সেটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সত্যসুন্দরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসি-কান্না মেশানো ব্যাকুলতার সঙ্গে বলতে লাগলো, ওরে আমার সোনা। -স, কি ভুল করেছি! ইস, চামড়া পুড়ে গেছে—কত ব্যথা লেগেছে তোমার। আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার কিছু খেয়াল থাকে না—আমি একেবারে তোমার যোগ্য না! তুমিই তো আদর দিয়ে আমার মাথাটা খেয়েছো! আহা রে, লক্ষ্মী সোনা, আমি তোমাকে মলম লাগিয়ে দিচ্ছি—

লীলা একদিকে শিশুর মতন সান্ত্বনা দিতে লাগলো সত্যসুন্দরকে—আবার তার সারা শরীরটাও উপহার দিয়েছে স্বামীকে। সে তার ভারি স্তন ও উরু ঘষছে সত্যসুন্দরের গায়ের সঙ্গে। বড় লোভনীয় এই ভঙ্গি।

একটু আগে আগুনের আঁচে সত্যসুন্দরের ত্বকে যে সামান্য সাড়া এসেছিল এখন তার চেয়েও কম তাপ বোধ করছেন। অর্থাৎ প্রায় কিছুই উপভোগ করতে পারছেন না। অথচ মাথা দিয়ে তিনি অনুভব করছেন, কি হচ্ছেব্যাপারটা এবং আরও কি হতে পারতো।

শরীরের কাছে হেরে যাচ্ছে বোধশক্তি।

আবার বোধশক্তিরও সীমা আছে?

লীলা কামোত্তেজক ভঙ্গীতে শরীরটা ব্যবহার করতে করতেও

চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে সত্যসুন্দরের বুক। এই চোখের জলের কোনো গূঢ় মানে আছে কি ? সত্যসুন্দর বুঝতে পারলেন না। কথা বলার ক্ষমতা চলে যাবার পর তিনি টের পাচ্ছেন, পৃথিবীতে কত রকম রহস্য আছে।

॥ ৪ ॥

দিনের পর দিন কেটে যায়, সত্যসুন্দরের সেই একই রকম অবস্থা। কোনো রকম উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। ঠোঁট যেটুকু নড়েছিল, সেইখানেই থেমে আছে।

তাঁর কাছে লোকজনের যাওয়া-আসা ক্রমেই কমে আসছে। প্রবীর অবশ্য প্রত্যেক দিন দু'বেলা আসে।

কয়েকদিন ধরেই একটা অবান্তর কথা সত্যসুন্দরের মাথায় ঘুরছে। মৃত্যুর আগে এর একটা উত্তর পাওয়া গেলে বেশ হতো।

সত্য এক, পণ্ডিতেরা তাকে বহুরকমে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেরকম বহু ব্যাখ্যার কথা সত্যসুন্দর নিজেও জানেন। কিন্তু সেই আদি সত্যটা কি ? মৃত্যুর উপান্তে এসেও তিনি ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হলেন না, একবারও মনের ভুলে বলে ফেলেন নি, ভগবান আমাকে বাঁচাও! তাহলে যাদের জীবনে ঈশ্বর নেই, তাদের জন্য কোনো সত্যও নেই ? এ জীবনটা বৃথা কেটে গেল। তিনি নিজের নাম বদলে সত্যসুন্দর রেখেছিলেন। এখন বুঝলেন, ভুল নাম রেখেছিলেন। তবু যাই হোক সত্যের সন্ধান না পেলেও তিনি সুন্দরকে দেখেছেন বহুরূপে।

লীলা যেন ইদানীং আরও সুন্দর হচ্ছে। বিবাহিত সম্পর্ক বিরহিত প্রণয়ে নারীদের রূপ খোলে। তাদের যৌবন বৃদ্ধি পায়। এটা ঠিকই। অথচ লীলা তার স্বামীর যত্নের কোনো ত্রুটি করে না। একই ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে শোয় রাত্রে।

লীলা কিন্তু এ-পর্যন্ত একবারও প্রথম দিনকার সেই ঘটনা সম্পর্কে কোনো কৈফিয়ৎ দেয়নি সত্যসুন্দরের কাছে। যেন সেরকম

কিছু ঘটেইনি। এখন সেই ঘটনা কেউ উল্লেখ করলে লীলা নিশ্চয়ই দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করবে। পুরুষদেরই বিবেকের কামড় বেশী থাকে। মেয়েরা সাধারণত অনেক কিছুই গোপন করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণত। কারণ সব সময় পুরুষ ও নারী সম্পর্কে এরকম তুলনামূলক আলোচনা করা যায় না। মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ অসাধারণ আছে। সত্যসুন্দর এরকম একজনকে অন্তত দেখেছেন—অনেককাল আগে।

প্রবীর যখন তখন আসে বটে কিন্তু সত্যসুন্দরের সামনে বেশীক্ষণ বসে না। সে এখন বাড়ির ছেলের মতন, এ বাড়ির বেশীর ভাগ কাজকর্মই তাকে করতে হয়। ডাক্তাররাও আলোচনা করে প্রবীরের সঙ্গে।

প্রত্যেকদিন যাবার সময় প্রবীর একবার করে বিদায় নিয়ে যায় সত্যসুন্দরের কাছে। মুখখানা মলিন করে বলে, চলি স্যার!

তখন লীলাও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এ ঘর থেকে বিদায় নেবার অনেক পরে নীচতলায় সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ হয়, সত্যসুন্দর ঐ শব্দটা শোনার জন্য কান পেতে থাকেন।

মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ মিনিট বাদে প্রবীর যায়। বিদায় নেবার পর থেকে ঐ সময়টা সে কি করে? লীলার সঙ্গে নিভৃতে তার অনেক কিছু জরুরি কথা থাকে?

সত্যসুন্দর বুঝবার চেষ্টা করেন, লীলার সঙ্গে প্রবীরের ভালো-বাসাটা কি রকম? শুধু কি শারীরিক? শারীরিক হলে তো একদিন ফুরিয়ে যাবে? লীলা কি তা বোঝে না? হয়তো লীলার মধ্যে সুপ্ত সন্তান কামনা আছে। সেই সন্তান কামনার তাড়নায় অনেক নারী এরকম করে। তারা নিজেরাও এটা বোঝে না ঠিক।

সত্যসুন্দর বিবাহ করেছেন তিনজনকে, এ ছাড়াও অন্যান্য নারীদের সঙ্গে তাঁর সংসর্গ হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের ভালো-বেসেছেন শুধু একবারই একজনকে। তিনি ছিলেন কাবুলে এক ভারতীয় অধ্যাপকের স্ত্রী। দুজনেই বাঙালী মুসলমান।

সত্যসুন্দর তখন নিতান্তই যুবক। দুনিয়ার কোনো বন্ধন নেই। প্রায়ই যেতেন সেই অধ্যাপকের বাড়ীতে। অধ্যাপক-দম্পতি দুজনেই খুব স্নেহ করতেন তাকে। বিশেষত অধ্যাপকের স্ত্রী, যিনি দেবীপ্রতিমার মতন সুন্দরী ছিলেন, খুবই দয়াময়ী। এই গৃহছাড়া বাউণ্ডুলে ছেলেটির ওপরে তাঁর খুবই মায়া পড়ে গিয়েছিল। প্রায়ই তিনি যত্ন করে সত্যসুন্দরকে নিজের বাড়িতে খাওয়াতেন। কখনো বিশেষ কিছু রান্না করলে চাকরের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনতেন তাঁকে।

সেই মহিলাটিকে সত্যসুন্দর অনায়াসেই দিদি বা বৌদির মতন শ্রদ্ধা করতে পারতেন। কিন্তু ঐ স্নেহ প্রীতির প্রতিদানে তিনি ঐ মহিলার প্রেমে পড়ে গেলেন। তিনি কাঙালের মতন ভালো-বাসতেন সেই মহিলাকে। একবার তাঁর চোখে চোখ ফেলবার জন্য তাকিয়ে থাকতেন উৎসুকভাবে।

ক্রমে অধ্যাপক-পত্নী বুঝতে পারলেন এই ব্যাপারটা। মেয়েরা পুরুষদের দৃষ্টি চেনে। মুখে কিছু বলেননি প্রথম প্রথম নীরব ভর্ৎসনা করতেন দৃষ্টি দিয়ে, তারপর সত্যসুন্দরের কাতর চোখের দিকে তিনিও চোখ রাখতেন, কিন্তু আর কিছু না। তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত।

একদিন তিনি সত্যসুন্দরকে বলেছিলেন, কেন এরকম পাগলামি করছো?

সত্যসুন্দর বলেছিলেন, জানি না।

সত্যসুন্দর কোনোদিন যে সেই মহিলাকে নিজের করে পাবে এমন আশা করেননি, তিনি যে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হননি, এতেই ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও অধ্যাপক-পত্নীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ কমে গেল এর পর। আর তিনি যখন তখন খাওয়ান না ডেকেও পাঠান না।

অধ্যাপক ছিলেন খুবই উদার। তাঁর অনুপস্থিতিতে অনেকেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসতো। মহিলাটির সুন্দর

চরিত্রের জন্য কেউ কোনো কথা বলেনি কখনো। শুধু সত্যসুন্দর সেই সব মজলিস থেকে বাদ পড়ে যেতে লাগলেন।

একদিন তিনি মহিলাকে বলেছিলেন, আমি তো আর কিছু চাইনি। একটু শুধু চোখের দেখা। তা থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলেন কেন?

অধ্যাপক-পত্নী বলেছিলেন, আমি আর সকলের সঙ্গেই যখন খুশী দেখা করতে পারি। অনেকের বাড়িতেও যেতে পারি। শুধু তোমার ব্যাপারেই এখন আমার লজ্জা করে।

—আপনি চান না যে আমি···

—না, তা নয়। চাই না বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু তোমার সামনে আর স্বাভাবিক হতে পারি না, অন্যরকম হয়ে যাই।

আফগানিস্তানে সেই সময় একটা গণ্ডগোল লাগায় অধ্যাপক-দম্পতি তাড়াহুড়ো করে লাহোর চলে যান। সত্যসুন্দর ছিটকে পড়েন অন্যদিকে। আর কখনো দেখা হয়নি। সত্যসুন্দর বাকি জীবনে ভোগ সম্ভোগ কম করেননি কিন্তু ভালোবাসা বুঝি শুধু ঐ একবারই। আর কিছু না, শুধু দেখা করার তীব্র ইচ্ছে।

প্রবীর আর লীলার মধ্যে ইচ্ছের টানটা কার বেশী। এরা অবশ্য চোখের দেখাতেই থেমে থাকেনি।

হঠাৎ আর একটা নতুন ঘটনায় সত্যসুন্দর সামান্য বিচলিত হয়ে পড়লেন।

লীলা এসে একদিন সকালে বললো, টাকা পয়সা কিছু নেই। তুমি যদি সইটাও অন্তত করতে পারতে। ব্যাংক থেকে কিছু তোলা যাচ্ছে না!

লীলা সত্যসুন্দরের শ্লথ ডান হাতটা তুলে আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। একটা ছোট্ট চিমটি কেটে জিজ্ঞেস করলো, টের পাচ্ছে?

সত্যসুন্দর রীতিমতন চমকে উঠেছিলেন। তাঁর শরীরে কিছু

বোধ না হলেও চিমটিটা লেগেছিল তাঁর বুকের মধ্যে।

লীলা তাঁকে দিয়ে চেক বইতে সই করাতে চায়। একটা চেকেই সব টাকা তুলে নেওয়া যেতে পারে। এ কিসের ষড়যন্ত্র ?

টাকা পয়সার ব্যাপারটাই বড় নোংরা। মনের মধ্যে নানারকম নোংরা চিন্তা আনে। সত্যসুন্দর নিজেকে এক ধমক দিলেন।

সত্যিই তো টাকার দরকার। টাকা পয়সা তো ফুরিয়ে যাবেই। তাঁর চিকিৎসার জন্য কি কম খরচ হয়েছে। সত্যসুন্দরের অনেক টাকা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সই করে না দিলে তো কেউ টাকা দেবে না।

লীলাব নিজস্ব খরচের জন্য তিনি একটা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কয়েক হাজার টাকা ছিল মাত্র। লীলা সেই টাকাই বোধ হয় এতদিন খরচ করেছে। আর কতদিন চলবে ?

লীলার সঙ্গে তিনি কোনো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলেন নি। কারণ, তিনি কখনো এরকম অসুস্থ হয়ে পড়বেন, স্বপ্নেও ভাবেন নি।

সন্ধেবেলা প্রবীর এসেছে, তার সামনেই লীলা বললো, ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে না পারলে কি হবে বলো তো ?

প্রবীর অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। / মৃদু গলায় বললো, দেখি আমি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি।

—তুমি আর কত করবে ?

সত্যসুন্দর বুঝলেন তাঁকে শোনানো হচ্ছে যে প্রবীর এখন এই সংসার চালাতে সাহায্য করছে।

অহংকারী সত্যসুন্দর তুমি এক সময় মনে করতে দুনিয়ার কারুকে তুমি গ্রাহ্য করো না। এবার বুঝে দেখো। তুমি অন্য কারুর সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্পর্ক রাখতে চাইতে না। এখন তোমার সংসার তোমার স্ত্রীর প্রেমিক চালাচ্ছে।

সত্যসুন্দর ভাবলেন, একসময় শরীরটা আমার দাস ছিল।

এখন আমি শরীরের দাস। কিংবা শরীর আমাকে বন্দী করেছে। আমি ইচ্ছা করলে পায়ের আঙুলটাও নাড়াতে পারি না এখন।

লীলা প্রবীরকে বললো, আজ তুমি দাড়ি কামাওনি কেন?

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লীলা প্রবীরের গালে হাত দিল।

প্রবীর একটু সরে গিয়ে বললো, এমনিই, মানে সময় পাইনি।

তোমাকে এত ঘোরাঘুরি করতে কে বলেছে। তুমি তো যথেষ্ট করেছো। এই করে করে এবার নিজের শরীরটা খারাপ করবে!

লীলা আবার প্রবীরের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার গলা জড়িয়ে ধরে অভিমানিনীর মতন বললো, তুমি আজকাল আমাকে একটুও আদর করো না।

প্রবীর ছিটকে সরে যাবার চেষ্টা করে বললো, কি হচ্ছে কি।

সত্যসুন্দরও ভাবলেন, কি হচ্ছে কি। লীলার কি মাথা খারাপ? তিনতলার ঘরটা এখন একদম ফাঁকা পড়ে থাকে। লীলা তো অনায়াসেই সেখানে প্রবীরকে ডেকে নিয়ে কাজের কথা বলার ছলে এইসব যা খুশী করতে পারে। এখানে কেন? এমনকি লাইব্রেরি ঘরগুলোতেও—

লীলা জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো সত্যসুন্দরের দিকে। একটা অসভ্য ভ্রূ ভঙ্গি করলো। তারপর বিশ্রী গলায় বললো, কি বুড়ো-দাদু, তুমি রাগ করবে? করো না যত ইচ্ছে রাগ, কারুকে তো বলতে পারবে না। প্রবীর আমার, বুঝলে? সম্পূর্ণ আমার। ওকে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

প্রবীরকে আর বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে লীলা আবার তার কণ্ঠলগ্না হয়ে তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো। প্রবীর ছটফট করছে। লীলা ফেলে দিল বুকের আঁচল সেদিনের মতন প্রবীরের বুকে ছোট ছোট কিল মেরে বলতে লাগলো কেন, কেন, কেন?

সত্যসুন্দর আজও এর কোনো মানে বুঝতে পারলেন না।

প্রবীর বললো, লীলাদি, আপনি শান্ত হোন।

—আবার লীলাদি! তোমার লজ্জা ক'রে না?

—চলো, বাইরে চলো !

—না, আগে বলো, আমাকে ভালোবাসো না ?

সত্যসুন্দরের মনে হলো এটা একটা ফিল্মের দৃশ্য। বাংলা ফিল্মের মতন অবাস্তব। লীলার কথাগুলো কিরকম কৃত্রিম শোনাচ্ছে। প্রবীরের চেহারা সুন্দর, কিন্তু অধিকাংশ ফিল্মের নায়কের মতন সে ব্যক্তিত্বহীন এবং আড়ষ্ট।

প্রবীর লীলাকে ছাড়িয়ে দ্রুত বাইরে চলে গেল। লীলা কিন্তু সঙ্গে গেল না। সে এগিয়ে এলো সত্যসুন্দরের খাটের দিকে, চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

সত্যসুন্দর ভয় পেলেন। মনে হলো, লীলা তাঁকে মারবে না তো ? মারলেও তিনি ব্যথা পাবেন না, তবু ভয় হচ্ছে কেন ? ভয় তো শরীরে হয় না, ভয়ের বাসা মানুষের মনে।

লীলা মারলো না। বললো, কি রাগ করছো ? রাগ ছাড়া তোমার আর কি-ই বা করার আছে ?

সত্যসুন্দর মনে মনে বললেন, তুমি ধরেই নিয়েছো আমি রাগ করেছি। আশ্চর্য। এত সহজে ধরে নেওয়া যায় !

লীলা বললো, বেশ করবো।

সত্যসুন্দর মনে মনে বললেন, তোমার স্বাস্থ্য আরও সুন্দর হয়েছে, রঙ হয়েছে উজ্জ্বল। এখন তুমি যা করবে, তাই-ই মানাবে।

লীলা চেঁচিয়ে ডাকলো, প্রবীর, প্রবীর !

প্রবীর বোধ হয় দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে আবার ফিরে এলো। শান্তভাবে বললো, স্যারকে এখন একটু ঘুমোতে দাও !

লীলা বললো, তোমার স্যার তো সারা দিন এবং রাত্তিরই ঘুমোচ্ছেন। আর কত ঘুমোবেন ?

লীলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। নির্লজ্জার মতন শাড়িটা খুলে ফেলে বললো, প্রবীর, তুমি আমাকে নাও।

প্রবীর ইতস্তত করছে।

লীলা আবার বললো, আমি এত করে বলছি, তবু তুমি দ্বিধা করছো!

প্রবীর সত্যসুন্দরের দিকে একবার আড়চোখে তাকালো। তারপর যেন সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। প্রবলভাবে লীলাকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করলো।

চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দেখে সত্যসুন্দর বেশ তৃপ্তি পান। দৃশ্যটি নিশ্চিত সুন্দর—দু'জন যুবক যুবতী মুখে চুম্বন করছে। সিনেমাতে এরকম কত দেখা যায়। তবে দু'জনেই পরিচিত হলে একটু অস্বস্তি লাগে। বিশেষত একজন যদি নিজের স্ত্রী হয় —তবু সত্যসুন্দর মনে মনে স্বীকার করলেন এটা দেখে তিনি খুশীই হয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে লীলা এই চুম্বনে যতখানি আবেগ মিশিয়েছে,সেরকম আবেগের সিকিভাগও কোনো দিন সত্যসুন্দরকে দেয়নি।

প্রবীর তার হাতটি রেখেছে লীলার পিঠে। লীলা নিজের শরীরটা যেন প্রবীরের শরীরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চায়। চুম্বনে চুম্বনে যেন ওরা পরস্পরের প্রাণরস শুষে নিচ্ছে।

দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। ওরা দু'জনে শুনতে পায়নি। সত্যসুন্দরই বলতে চাইলেন, দরজায় ছিটকিনি দেওয়া আছে তো? কণ্ঠস্বর থাকলে তিনি নিশ্চিত ওদের সাবধান করে দিতেন এই সময়।

তার দরকার হলো না। প্রবীরই নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে গেল দরজার কাছে। লীলা শাড়ীটা তুলে নিয়ে আলমারির পাশে সরে দাঁড়ালো।

প্রবীর কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেল বাইরে।

লীলা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সত্যসুন্দরের বুকের ওপর। কান্নার বৃষ্টিধারা নেমেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বললো, তবু তুমি কিছু বললে না? তবু বললে না? আমি এত খারাপ। আমি তোমার মান সম্মান সব নষ্ট করেছি! তুমি আমাকে বকবে

না? তুমি আমাকে মারো, মারো আমাকে।

সত্যসুন্দরের ক্ষমতা থাকলে তিনি একটা হাত তুলে লীলার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতেন এখন। লীলা কত ছেলেমানুষ!

চোখের জল মুছে লীলা একটু সুস্থির হলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, হঠাৎ মনে কোনো আঘাত পেলে তুমি ভালো হয়ে উঠতে পারো! তাই আমি তোমার চোখের সামনে……লাজলজ্জা সব বিসর্জন দিয়ে……

ক্ষমতা থাকলে সত্যসুন্দর এখানে হাসতেন। এতক্ষণ যা হয়ে গেল, তা কি ডাক্তারের নির্দেশে? আধুনিক বিজ্ঞান কত উন্নত হয়েছে। ডাক্তার কি বলে দিয়েছিল, ঠিক কটা চুম্বন আর ক'বার আলিঙ্গন দরকার? সেই জন্যই ব্যাপারটা অবাস্তব নাটক নাটক লাগছিল। লীলা যে অতি কাঁচা অভিনেত্রী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লীলা স্বামীর চোখের সামনে কুলটা সেজে তাঁকে সুস্থ করতে চেয়েছে। সত্যি সুস্থ হয়ে উঠলে সত্যসুন্দর কি এটা মেনে নিতেন? অন্য স্বামীরা কি নেয়? নাকি ততটুকুই সুস্থ হওয়া দরকার, যাতে তিনি চেকে সই করতে পারেন।

লীলা আজ এত বেশী করে কাঁদছিল কেন? স্বামীর সঙ্গে এরকম করতে হলো, সেই অনুতাপে? কিংবা, সার্থক হলো না বলে? অসময়ে কেউ এসে দরজা ধাক্কা দেওয়ায় যে অতৃপ্তি রয়ে গেল, তার জন্যও কান্না পাওয়া অসম্ভব কি? এইসব জটিল প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর না পেলে মরতেও ইচ্ছে করে না।

ক'দিন পর এইটা যেন লীলার একটা খেলা হয়ে দাঁড়ালো। বাড়িতে এত জায়গা থাকতেও সে সত্যসুন্দরের চোখের সামনেই প্রণয় লীলা চালাতে চায়। প্রবীরের আড়ষ্টতা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। বহুবার রিহার্সালের পর যেমন হয়। এখন সে অনেক সময় নিজে থেকেই লীলাকে জড়িয়ে ধরে খুনসুটি করে। লীলা

সত্যসুন্দরের দিকে মুখ ভেংচি কেটে বলে, এই যে বুড়ো দাদু, দ্যাখো, দ্যাখো—। এই বলে সে জিভ দিয়ে প্রবীরের গাল চেটে দেয়।

সত্যসুন্দর যাতে ভালো করে দেখতে পারেন, সেইজন্য ওরা দু'জনে ধরাধরি করে তাঁকে উঁচু করে বসিয়ে দেয়। পেছনে দেয় বালিশের ঠেস।

সত্যসুন্দরের একঘেয়ে লাগে এখন। ওরা বোঝে না কেন যে বারবার এই একই জিনিস ওদের দু'জনের কাছে আনন্দদায়ক হতে পারে বটে, কিন্তু অন্য কেউ আনন্দ পাবে না। এটাও কি ডাক্তারের নির্দেশ?

একদিন দুপুরে সত্যসুন্দর ঘুমিয়ে ছিলেন, হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠলেন। বহুকালের পুরোনো স্নেহের স্পর্শ।

তিনি চোখ মেলে তাকালেন, তাঁর পিসীমা। বুড়ি এখন প্রায় অন্ধ, কেউ হাত ধরে নিয়ে না এলে হাঁটাচলা করতে পারেন না। এতদিন কেউ তাঁকে নিয়ে আসেনি। আজ নিজেই অতিকষ্টে এসেছেন।

পিসী সত্যসুন্দরের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, ও রাজু, রাজুরে! তোর নাকি খুব অসুখ?

লীলা বোধ হয় পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। জানতে পারলে বুড়িকে আগেই বিদায় করে দিত। এখন টাকার টানাটানি চলছে, তবু যে লীলা বুড়িকে এখনো দুটো খেতে দেয়, এই ঢের।

বুড়ি বললো, ও রাজু কথা বলিস না কেন? তোর মাকে কাল স্বপ্নে দেখলাম। সে বললো, আমার ছেলেটা বুঝি এবার সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!

সত্যসুন্দর বললেন, পিসী!

তারপর ডানহাত দিয়ে তিনি পিসীর হাতখানা চেপে ধরলেন।

এবং তারপরই তাঁর বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। মনে মনে নয়, তিনি সত্যি পিসী কথাটা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর

ডানহাত সত্যিই পিসীর একটা হাত চেপে ধরেছে।

এমন উত্তেজিত বোধ করতে লাগলেন যে মনে হলো, এক্ষুণি হার্ট ফেইল করে যাবে। তিনি মনে মনে বারবার বলতে লাগলেন, সত্যসুন্দর, শান্ত হও! শান্ত হও!

পিসী বললেন, আমার এক নাতি কাল সকালে এসে আমাকে নিয়ে যাবে ক'দিনের জন্য। তাই তোকে বলতে এলাম। আমাকে তো কেউ ওপরে আনে না। কাল যাবো, আবার একমাস পরেই ফিরে আসবো।

সত্যসুন্দর ফিসফিস করে বললেন, আচ্ছা!

সেইদিন রাত্তিরে সত্যসুন্দর দেখলেন শুধু ডানহাত নয়, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটাও তিনি নাড়াতে পারছেন। বোধ হয় শরীরের একদিকের অবসাদ চলে যাচ্ছে। তারপর আরেক দিক?

ডান হাত ঠিক হয়েছে, এখন তিনি অনায়াসেই চেক সই করতে পারেন। তাঁর টাকার অভাব নেই। প্রবীরের সব ঋণ তিনি শোধ করে দিতে পারেন এক কলমের খোঁচায়।

সন্ধ্যেবেলা যখন লীলা আর প্রবীর ঘরে এলো, তিনি কিছুই বললেন না। সবকিছু বলারই একটা বিশেষ মুহূর্ত আছে তো!

এখন আর লীলা কিংবা প্রবীর তাঁর কোনো খবরও জিজ্ঞেস করে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলে। টাকা পয়সার প্রশ্ন নিয়ে একটু খিটিমিটি হয়, ঠিক যেন স্বামী-স্ত্রীর মতন। আবার একটু পরেই বেলেল্লাপনা শুরু হয়ে যায়। একটা জ্যান্ত নির্জীব মানুষ যেন ওদের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে আরও।

সেদিন ওরা দু'জনেই সত্যসুন্দরের খাটে এসে বসলো। খুন-সুটি করতে করতে মগ্ন হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে।

লীলা এক সময় সত্যসুন্দরের ডানহাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। বিদ্রূপ করে বললো, খুব রাগ হচ্ছে? ইচ্ছে হচ্ছে না আমাকে একটা চড় কষাতে? এই নাও, আমি মেরে দিচ্ছি!

লীলা সত্যসুন্দরের হাতটা নিয়ে নিজের গালে আলতো করে

আঘাত করে। তারপর হি-হি করে হেসে হাতটা ছেড়ে দেয় আবার। সত্যসুন্দর হাতটাকে ধপাস করে পড়ে যেতে দেন।

আদুরে খুকীর মতন লীলা বললো, এবার আমি মারি? দারুণ জোরে সত্যসুন্দরের গালে এক চড় কষায়?

প্রবীর জিজ্ঞেস করে, স্যার, আপনার লাগে নি তো?

সত্যসুন্দরের গালটা জ্বালা করছে। তিনি ভাবলেন, এই কি সুসংবাদটা জানাবার সেই বিশেষ মুহূর্ত? তিনি বলে উঠবেন কি, লীলা আমি চেক সই করতে পারি, তুমি ইচ্ছে হলে আমার সব টাকা তুলে নিতে পারো!

অথবা, সে কথা না বলে তিনি কি অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যিই লীলার গালে একটা চড় কষাবেন?

হঠাৎ এরকম আনন্দ বা আঘাত পেয়ে লীলার যদি আবার পক্ষাঘাত হয়ে যায়? থাক দরকার নেই। তিনি দুটোর একটাও করলেন না।

তিনদিন পরে সত্যসুন্দর দেখলেন, তাঁর ডানহাত ও ডান পা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বাঁ দিকটা এখনো অসাড় আছে। তবু তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করতে পারেন কোনোরকমে পা ঘষে ঘষে।

তখন মধ্যরাত। সত্যসুন্দর খাট থেকে নেমে ঘরের কোণে রাখা লাঠিটা নিয়ে নিলেন। এই লাঠিতে ভর দিয়ে মনে হয় তিনি অনেক দূর যেতে পারবেন।

তিনি একটুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস নিলেন। এই পৃথিবীতে তিনি আবার নিজের অধিকার ফিরে পেতে চান। কি অধিকার?

ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে লীলা রোজ যেমন ঘুমোয়, আজও তেমনি ঘুমিয়ে আছে। সারা রাত নীল আলো জ্বলে। তিনি একদৃষ্টে লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার যুগপৎ রাগ এবং স্নেহ জাগতে লাগলো। এক একবার মনে হলো, তাঁর একটা হাতেই যা জোর আছে তাই দিয়ে তিনি লীলার গলা-

টিপে ধরে মেরে ফেলতে পারেন। আবার মনে হলো, ঘুমোলে ওকে কিরকম নিষ্পাপ দেখায়। যেন একটা শিশু। জীবনটা নিয়ে কি যে করছে, নিজেই জানে না।

সত্যসুন্দর বেরিয়ে এলেন সেই ঘর থেকে। নিজেকে মনে হচ্ছে খাঁচা থেকে মুক্ত কোনো পশুর মতন। শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ ছাড়া আর কোনো আনন্দ নেই এখন। জীবন যখন অপর্যাপ্ত ছিল, তখন মৃত্যু সম্পর্কে কোনো চিন্তা ছিল না। তখন আনন্দের কতরকম উপকরণ খুঁজতে হতো। এখন বেঁচে থাকাই একমাত্র কথা।

তিনি এসে ঢুকলেন একটা লাইব্রেরি ঘরে। বসলেন ছোট টেবিলে। চার পাশে র‍্যাক ভর্তি রাশি রাশি বই। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়।

টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। এখানেও রয়েছে একটা চেক বই, কলম। বেশ সাবলীল ভাবেই চেকের পাতায় নাম সই করতে পারলেন নিজের। কোনো টাকার অঙ্ক বসালেন না। লীলা সব নিক! সেই বাল্যকালে তিনি যেমন একবার ঘর ছেড়ে বাউণ্ডুলের মতন বেরিয়ে পড়েছিলেন, এখন সেইরকম আবার বেরিয়ে পড়বেন। দেখা যাক পারা যায় কিনা!

ড্রয়ারে কয়েকটা চুরুট ও একটা লাইটারও ছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হলো একটা চুরুট খেতে! এতে কি আনন্দ পাওয়া যাবে আর?

চুরুটটা মুখে দিয়ে তিনি এক হাতে টিপে টিপে লাইটারটা জ্বালালেন। চুরুটটা ধরাবার পর দু'একটা টান দিতেই তাঁর খুব কাশি এলো। তিনি বিরক্ত হলেন। কাশির শব্দ শুনে যদি লীলা জেগে ওঠে?

টেবিলের ওপর কতগুলো কি পুরোনো চিঠিপত্র পড়েছিল। খোলা হয়নি। অভ্যেসবশত একবার ভাবলেন, চিঠিগুলো পড়বেন। কিন্তু মন বদলে ফেললেন পরক্ষণে! কি হবে আর এসব দিয়ে!

ছোট ছেলের মতন খেলাচ্ছলে তিনি লাইটারের আগুন ছোঁয়াতে লাগলেন চিঠিগুলোতে। কয়েকটা জ্বলে উঠলো, তাঁর ভালো লাগলো। জ্বলন্ত চিঠিগুলো তিনি ফেললেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে সেখানেও আগুন ধরলো। বইয়ের ঘরে এরকম আগুন বিপজ্জনক। কিন্তু হঠাৎই এইসব বই ও মানুষের মেধার ওপর অসম্ভব রাগ এসে গেল তাঁর। তিনি জ্বলন্ত কাগজ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

আগুন যখন বেশ ভালো মতন ধরে উঠলো, ধোঁয়ায় বসে থাকা কষ্টকর হলো, তখন সত্যসুন্দর কি ভেবে যেন চেক বইটাও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আগুনে। লাইটার, চুরুট সব। তারপর ভাবলেন, ঘুমন্ত লীলাকেও পাঁজাকোলা করে তুলে এনে এই আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে কেমন হয়?

কিন্তু তিনি সেরকম কিছুই করলেন না। বই পোড়া বিশ্রী ধোঁয়া আর দাউ দাউ আগুনের দৃশ্য দেখতে লাগলেন চুপ করে বসে।

ফিরে আসা

রবিবার ছাড়া প্রতিটি সকাল একেবারে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। বাড়িতে ঘড়ির সংখ্যা একুশটি, জ্ঞানব্রতর খুব ঘড়ির শখ। দেশে-বিদেশে যখনই বেড়াতে যান, বিভিন্ন আকৃতির একটি করে ঘড়ি সংগ্রহ করে আনেন। এগুলোতে চাবিও দেন তিনি নিজের হাতে।

এ ছাড়া ডাইনিং হলে আছে একটি বড় দেওয়াল ঘড়ি। এটা জ্ঞানব্রতর বাবার আমলের। এখনো বেশ চলে, দু'এক বছর অন্তর অন্তর অয়েলিং করতে হয় শুধু। টক্ টক্ টক্ টক্ করে সেটিতে প্রতি মুহূর্তের শব্দ হয়। জানিয়ে দেয় যে সময় চলে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজবার একটা খর-র-র খর-র র আওয়াজ ওঠে, সেই আওয়াজ শুনলেই রান্না ঘরে কান খাড়া করে রতন। ডেকচিতে গরম জল চাপানোই থাকে, ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে বলবে, বাথরুমে স্নানের জল দেবো ?

বারো মাসই গরম জলে স্নান করা অভ্যেস জ্ঞানব্রতর।

ন'টা পর্যন্ত বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়েন, রতন এসে গরম জলের কথা বললেই স্নানের ঘরে চলে যান।

সাড়ে ন'টায় খাওয়ার টেবিলে। দশটায় ড্রাইভার গাড়ি বারান্দার নীচে গাড়ি বার করে তৈরী থাকে।

স্মরণকালের মধ্যে কোনো দিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

সুজাতা নিজের হাতে কিছু রান্না করে না বটে, কিন্তু খাবার পরিবেশন করে নিজের হাতে। রতন সব কিছু সাজিয়ে রেখে যায় টেবিলের ওপরে।

খাবার টেবিলে এই আধঘণ্টা সময়ই যা সুজাতার জ্ঞানব্রতর সঙ্গে কথাবার্তা হয় সকালে।

জ্ঞানব্রত ওঠেন খুব ভোরে। সুজাতার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ন'টা বেজে যায়। জেগে উঠেই কোনো রকমে হুটোপাটি করে মুখ চোখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে ছুটে আসে খাবার টেবিলে। সুজাতা না আসা পর্যন্ত খালি প্লেট সামনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন জ্ঞানব্রত। সুজাতা এসেই বিভিন্ন পাত্রের ঢাকনা খুলে বলে, আজ কী কী করেছে দেখি? এঁচোড়ের তরকারি, চিংড়ি মাছের মালাই-কারি…পনির দিয়ে পালং শাক করে নি? রতন, রতন!

ছেলে পড়ে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুলে, মেয়ে উজ্জয়িনীর স্বভাবটাও অনেকটা মায়ের মতন। কলেজে যাবার ঠিক আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এজন্য মেয়েকে কোনদিন শাসন করেন নি জ্ঞানব্রত, কারণ স্কুলে প্রতিটি পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়েছে, পঞ্চম স্থান পেয়েছে স্কুল ফাইনালে। ও রাত জেগে পড়ে। উজ্জয়িনীর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে, তাই বোধ হয় ফরাসীদের মতন ওর রাত জাগার অভ্যেস।

জ্ঞানব্রতকে খাবার দিয়ে সুজাতা সেই সঙ্গে নিজে চা খায়। সুজাতার বয়েস এখন ঠিক চল্লিশ, কিন্তু শুধু সাজপোষাকের গুণেই নয়, তার শরীরটা এখনো এমন তাজা যে তার বয়েস তিরিশ বললে কেউ চট করে অবিশ্বাস করবে না। সপ্তদশী উজ্জয়িনী যে সুজাতার মেয়ে তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না, ভাবে বুঝি দুই বোন।

সুজাতার চেয়ে ঠিক দশ বছরের বড় জ্ঞানব্রত, পুরুষ মানুষের পক্ষে এ বয়েস কিছুই নয়। শরীরটা তাঁর ভাঙতে শুরু করেছে। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুলই বেশী, চামড়ায় নেই মসৃণতা, চোখের দু'পাশে কালের পায়ের ছাপ। সার্থকতা তাঁর শরীর থেকে মূল্য আদায় করে নিয়েছে।

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো সুজাতা। জ্ঞানব্রত তিন মাস আগে সিগারেট-চুরুট-পাইপ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, সুজাতা ওসব কিছু চিন্তাই করে না।

সকালের প্রথম সিগারেটটিতে পরিতৃপ্তির সঙ্গে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো ঃ

—তুমি আজ কখন গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারবে ?

জ্ঞানব্রত বললো, তোমার কখন চাই বলো ?

—সাড়ে এগারোটায় !

—তার মানে সাড়ে বারোটা তো ?

সুজাতা হাসলো।

জ্ঞানব্রতর যেন প্রতি মুহূর্তে ঘড়ির হিসেব, সুজাতা তার ঠিক উল্টো। বাড়ী থেকে যদি সাড়ে এগারোটায় বেরুবে ভাবে তো, কিছুতেই সে বারোটার আগে তৈরী হতে পাবে না। জীবনে একটা সিনেমাও বোধ হয় সে শুরু থেকে দেখতে পারে নি।

—কোথায় যাবে ?

—আমাদের মহিলা সমিতির একটা মিটিং আছে।

—ঠিক আছে, সাড়ে এগারোটাতেই গাড়ি আসবে।

—চুমকি এই রবিবার ওর বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যেতে চায়। তোমাকে কিছু বলেছে ?

—তোমাকে বলাই তো যথেষ্ট। কোথায় যাবে ?

—ব্যাণ্ডেল।

জায়গাটার নাম শুনতে পেলেন না জ্ঞানব্রত, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি শুনতে পেলেন গানটা।

যোধপুর পার্কে একেবারে আনোয়ার শা রোডের ওপরে মাত্র দু'বছর আগে তৈরী করেছেন এই নতুন বাড়ী। সামনে বড় রাস্তা, তার উল্টোদিকেই একটা পার্ক, সুতরাং সামনের দিকটা কোনদিন ব্লক্‌ড হবে না। সাত কাঠা জমি, সামনে খানিকটা বাগান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় চারখানা ঘর, নিচে চারখানা। তিন তলাটা পুরোই ভাড়া দেওয়া হয়েছে চেক কনসুলেটের ফার্ষ্ট সেক্রেটারীকে। দুটি গ্যারেজ।

যখন এই বাড়ী বানান জ্ঞানব্রত তখন ডান পাশের তিন কাঠার জমিটাও কিনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মালিকানা নিয়ে কি যেন গণ্ডগোল ছিল। হঠাৎ এই ছ'মাস আগে সেখানে একটা তিনতলা বাড়ী উঠে গেছে। অনেক লোকজন, বেশ গোলমাল হয় ও বাড়ীতে। বিভিন্ন তলায় একই সঙ্গে রেডিও রেকর্ড প্লেয়ার চলে। এইসব আওয়াজে জ্ঞানব্রত একটু বিরক্ত হন, কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই।

সেই রকমই, ও বাড়ির রেডিওতে একটা গান বাজছে। সেদিকে হঠাৎ মন আটকে গেল জ্ঞানব্রতর।

…শহরে ষোলজন বোম্বেটে ;
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি
নালিশ করিব আমি, কোনখানে কার নিকটে।
পাঁচজনা ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর…হলো।

গানটা শুনতে শুনতে জ্ঞানব্রতর মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—ও কি, তুমি পুডিংটা খেলে না ?

যতই সাহেব মানুষ হন জ্ঞানব্রত, অফিস থেকে দুপুরে তিনি কোথাও লাঞ্চ খেতে যান না। দোকানের খাবার তাঁর একেবারে পছন্দ নয়। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার তিনি। সেখানে মাঝে মাঝে যান সাঁতার কাটতে। তারপর দু'এক পেগ মদ্যপান করেন। কিন্তু কোনো খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করেন না।

সকালবেলা বাড়ীর রান্না তিনি খেয়ে যান তৃপ্তির সঙ্গে। আজ বিমর্ষভাবে বললেন, পুডিং ? না, থাক, খেতে ইচ্ছে করছে না।

—হঠাৎ তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলে ?

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। কোনো কথা বলছো না। শরীর ঠিক আছে তো?

—শরীর? হ্যাঁ, শরীর ভালো আছে।

উঠে বাথরুমে চলে গেলেন তিনি। আয়নার দিকে চেয়ে তার মনে হলো, চুল কাটা দরকার। প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার তার চুল কাটার দিন। আজ মাসের মোটে অর্ধেক। এর মধ্যে চুল বেশী বড় মনে হচ্ছে কেন।

জ্ঞানব্রতর বাবার ছিল মাথা ভর্তি টাক। সবাই বলতো জ্ঞানব্রতরও চুল থাকবে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও চুল একটুও পাতলা হয় নি।

বাবাকে অবশ্য খুব ভালো মনে নেই জ্ঞানব্রতর। তিনি যখন মারা যান তখন জ্ঞানব্রতর বয়স এগারো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে হাতের ঘড়িটা দেখলেন। দশটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। এখন তিনি খয়ের ছাড়া একটি পান খাবেন। তারপর গলায় টাই বাঁধবেন। সিগারেট চুরুট ছেড়ে দেবার পর এই পান খাবার অভ্যেসটা হয়েছে।

নিজের ঘরে যেতে বাঁ পাশে মেয়ের ঘর পড়ে। দরজাটা খোলা, সারা বিছানা তছনছ করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে উজ্জয়িনী। মায়ের চেয়েও বেশী রূপসী হয়েছে, ঠিক যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। একটুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্ঞানব্রত। দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে গেল? আর কিছুদিন পরেই কোনো পরপুরুষের হাতে ওকে সঁপে দিতে হবে।

ছেলে শুভব্রতর বয়েস চোদ্দ, বছরে মাত্র তিনমাস দেখা হয় তার সঙ্গে।

সুজাতার গালে একটা অন্যমনস্ক চুমু দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীর ভাবে নামতে লাগলেন তিনি।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে দরজা খুলে তটস্থভাবে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার।

গাড়ি একেবারে চকমকে তকতকে না থাকলেই বিরক্ত হন

জ্ঞানব্রত। আজ সেদিকে নজর দিলেন না, উঠে বসলেন।

প্রথমে যেতে হবে বেহালার কারখানায়। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগে। এই সময়টুকু তিনি ঘুমিয়ে নেন। গাড়িতে ওঠা মাত্র চোখ বুজে আসে।

আজ ঘুম এলো না।

নিজেই তিনি একটু বাদে অবাক হয়ে ভাবলেন, আমার মন খারাপ লাগছে কেন? কোন কারণ নেই তো! শরীর খারাপ নয়। তাহলে?

এর পরেই মনে এলো সেই গানের কথাগুলো ঃ

শহরে ষোল জন বোম্বেটে

করিয়ে পাগলপারা নিল...

তারপর?

বাকি কথা আর মনে পড়ছে না। সুরটা অবশ্য ঘুরছে মাথার মধ্যে।

এ গানের মানে কী?

জ্ঞানব্রত খুব যে একটা গান-বাজনার ভক্ত তা নয়। তার বাড়িতে বিলিতি রেকর্ডই বাজে বেশী। বড় জোর দু'চারটে রবীন্দ্র সঙ্গীত। এ গান তো মনে হচ্ছে দেহতত্ত্ব বা ঐ ধরনের, এ সব গান কে শুনবে? রেডিও আছে, কিন্তু কক্ষনো খোলা হয় না। জ্ঞানব্রত শেষ রেডিও শুনেছেন ইলেকশনের খবর শোনার জন্য। নিয়মিত রেডিও শোনে মধ্যবিত্তরা।

কারখানার গেটের কাছে যখন গাড়ি এসেছে, তখন জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো, নিল তারা সব লুটে! শহরে ষোলজন বোম্বেটে—করিয়ে পাগল পারা নিল তারা সব লুটে...।

জ্ঞানব্রত এই গানটা যেন আগে কখনো শুনেছেন।

কবে, কোথায়?

কারখানার দেখাশুনোর ভার তাঁর ভাগ্নে শেখরের ওপর। জ্ঞানব্রত এ কারখানা নিয়ে মাথা ঘামান না, শিগগিরই মাদ্রাজে

আর একটি কারখানা খুলবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন। তবু রোজ একবার করে এখানে আসেন। শেখর কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, জ্ঞানব্রত সেই সব রিপোর্টের ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে হ্যাঁ কিংবা না বলে দেন।

একুশ বছর আট মাস বয়েস পর্যন্ত জ্ঞানব্রত ছিলেন এক অতি সাধারণ রিফিউজি ছোকরা। পড়াশুনোয় ভালোই ছিলেন, কিন্তু শৈশবে পিতৃহীন বলে মামার বাড়িতে মানুষ, টিউশানী করে নিজের খরচ চালাতে হতো।

মামাদের অবস্থা ভালো ছিল না। জ্ঞানব্রতর মা ছিলেন তার ভাইদের বাড়ীতে বিনি-মাইনের রাঁধুনি।

টুথপেষ্টের ছিপির মধ্যে যে একটা ছোট্ট গোল শোলার চাক্তি থাকে, সেই দিয়ে ব্যবসা শুরু। ঐ ছোট্ট জিনিসটাও খুব জরুরী, ওটা থাকে বলেই টিউব থেকে টুথপেষ্ট বেরিয়ে আসে না। অত ছোট জিনিস কোন টুথপেষ্ট কোম্পানি নিজে বানায় না, বাইরে থেকে কেনে।

মূলধন ছিল মাত্র দেড়শ টাকা। একটা পাঞ্চিং মেশিন আর কিছু কাঁচা মাল। কারুকে না জানিয়ে জ্ঞানব্রত শুরু করেছিলেন এই কারবার, পুরোটা লোকসান গেলেও তো তার নিজের দেড়শ টাকাই যাবে।

এখন তিনি একটি প্রখ্যাত মার্কিন টুথপেষ্ট কোম্পানীর সঙ্গে কোলাবোরেশনে এদেশে তৃতীয় টুথপেষ্ট কারখানা খুলছেন। মামাদের উপকারের ঋণ শোধ করে দিয়েছেন তিনি, প্রত্যেক মামাকে নিয়েছেন কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডে, দু'জন মামাতো ভাইকে বিলেতে পড়িয়ে এনেছেন। শুধু তাঁর মা-ই কোন সুখ-ভোগ করে যেতে পারলেন না। সবেমাত্র এই বেহালার কারখানাটা লীজ নেওয়া হয়েছে, সেই সময় মারা গেলেন মা।

অফিস ঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন জ্ঞানব্রত, হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—শেখর, তুই এই গানটা জানিস? শহরে ষোল-

জন বোম্বেটে। করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে।···

শেখর একেবারে অবাক।

তার মামা অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কাজের মধ্যে কোনো রকম ছ্যাবলামি করবেন তিনি, এ তো কল্পনাই করা যায় না। এ কি একটা বিদঘুটে গানের কথা জিজ্ঞেস করছেন!

—গান? এটা কী গান?

জ্ঞানব্রত হাসলেন।

পুরনো অভ্যেস মতই বাঁ হাতের দুটি আঙুল কাঁচি করে ধরলেন মুখের সামনে, যেন সেখানে রয়েছে অদৃশ্য সিগারেট।

—হঠাৎ এই গানটা শুনলাম রেডিওতে। তারপর অনবরত এটা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

—রেডিওতে শুনলেন? কখন?

—আজই খেতে বসে···

নতুন নামকরা শিল্পপতি এবং সদা ব্যস্ত জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি সকাল বেলা খাবার টেবিলে বসে রেডিওতে পল্লীগীতি শুনেছেন —এ দৃশ্যও শেখরের পক্ষে কল্পনা করা দুষ্কর। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা রেডিওর গান নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

—মনে হচ্ছে যেন এই গানটা আমি আগে কোথাও শুনেছি। কোথায় শুনলাম বল তো?

—আমি তো এরকম গান কক্ষনো শুনি নি!

—তোর বাড়িতে ফোন কর তো?

—বাড়িতে?

—হ্যাঁ, তোর মাকে একবার ডাক।

দুই দিদি জ্ঞানব্রতর। বড় দিদি থাকেন ভূপালে। শেখরের মা ছোড়দি। ছেলেবেলায় খুব সুন্দর গান করতেন। তারপর যা হয় অধিকাংশ বাঙালী মেয়েদের। বিয়ের পর গান বাজনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যায়।

—ছোড়দি, আমি গেনু বলছি।

বয়েসে বড় দিদি হলেও প্রতিমা তাঁর এই ছোট ভাইকে একটু সমীহ করেন। জীবনে এতখানি উন্নতি করেছে সে, তাঁর ছেলেকে বিরাট চাকরি দিয়েছে। এক সময় গেনু বলে ডাকলেও এখন বলেন জ্ঞান।

—কী রে, কী হয়েছে?

—ছোড়দি, তুমি তো এক সময় অনেক গান করতে। তুমি এই গানটা জানো? শহরে ষোল জন বোম্বেটে···

—না তো!

—ভালো করে ভেবে দেখো, কখনো শোনো নি?

—না। হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

এই গানটা আমার মাথায় গেঁথে গেছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। আগে শুনেছি মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত ছেলেবেলায়।

সুজাতা কেমন আছে?

—ভালো আছে। তোমাকে সুরটা শোনাবো? তা হলে হয়তো তোমার মনে পড়তে পারে।

অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য! আরও একজন কর্মচারী এই সময় ঘরে ঢুকেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্কাণ্ডালাইজড, শেখরের সেই অবস্থা। গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট কোম্পানির একান্নভাগ শেয়ারের মালিক জ্ঞানব্রত অফিস ঘরে বসে অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ে টেলিফোনে পল্লীগীতির সুর শোনাচ্ছেন দিদিকে। মাথাটা খারাপ হয়ে যায় নি তো? ঘড়ির কাঁটা ধরে এই লোকের জীবন চলে।

প্রতিমা টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই সময় তাঁর কি বলা উচিত। তাঁর ঝোঁক ছিল নজরুল ও অতুল প্রসাদের গানে; সেও কতকাল আগের কথা। এ গান তো তিনি শোনেন নি কখনো। তবু গুরুত্বপূর্ণ ছোট ভাইকে খুশী করবার জন্য তিনি আমতা আমতা করে বললেন :

—হ্যাঁ, কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

—এর পরের কথাগুলো জানো?

—না। খুশীকে অনেকদিন দেখিনি। একদিন আসতে বলিস না আমাদের এখানে।

উজ্জয়িনীর ডাক নাম খুশী! সে তার মাসীদের ভক্ত, পিসীর বাড়ীতে যেতে চায় না।

—আচ্ছা বলবো। তা হলে গানটা তুমি জান না। তোমার কাছ থেকে শুনি নি।

—রাস্তার ভিখিরিরা অনেক সময় এইরকম গান গায়।

টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েই অভ্যেস মতন ঘড়ি দেখলেন জ্ঞানব্রত। ঠিক সাড়ে এগারোটা বাজে। সুজাতাকে গাড়িটা পাঠাবার কথা ছিল।

এরকম ভুল তার কখনো হয় না।

সুজাতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিলেতে, সেই প্রথমবার জ্ঞানব্রত ও দেশে গিয়েছিলেন। এখন বছরে দু'বার তিনবার তাঁকে বিলেত-আমেরিকায় যেতে হয়। সুজাতা তখন ওখানে পড়াশুনা করছে। আলাপের তৃতীয় দিনেই জ্ঞানব্রত বুঝেছিলেন, এই মেয়েটিকে না পেলে তাঁর চলবে না। প্রথম যৌবনেই ব্যবসা শুরু করে তার মধ্যে একবারে ডুবে গিয়েছিলেন জ্ঞানব্রত, কোনো মেয়ের দিকে তাকাবার সময় পান নি, সুজাতাকে দেখেই তার মনে হয়েছিল যদি বিয়ে করতে হয় তা হলে একেই, নইলে আর কারুকে নয়।

সেবার বিলেতে থাকার কথা ছিল তিন সপ্তাহ, থেকে গেলেন দু'মাস।

কেনসিংটনের একটা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে জ্ঞানব্রত দুম করে সুজাতাকে বলেছিলেন, আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তা হলে কাল আমি আসবো, নইলে আজই আমাদের শেষ দেখা।

সুজাতা বলেছিল, কিন্তু আর পাঁচ মাস বাদে যে আমার পরীক্ষা!

—আমি এখানেই বিয়েটা সেরে দেশে ফিরে যাবো। আপনি পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে তারপর ফিরবেন।

—কেন, আমি দেশে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?

—না।

—এত অধৈর্য কেন আপনি?

—আমি চলে গেলেই আমার চেয়ে যোগ্য কেউ আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলতে পারে।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার ধারণা ছিল, যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে, তারা পরস্পরকে তুমি বলে। এ রকম গুরুগম্ভীর ভাষায় কেউ যে কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা আমি জন্মে ভাবি নি।

আসলে জ্ঞানব্রত লাজুক। ব্যবসায়ীদের জগতে তিনি গম্ভীর মানুষ বলে পরিচিত, সেটা লাজুকতারই একটা দিক। সুজাতাকে বিয়ের দিন পর্যন্ত 'আপনি'র বদলে তুমি বলতে বাধো বাধো ঠেকেছে!

তক্ষুণি নিজের গাড়িটা সুজাতাকে পাঠিয়ে দিয়ে কারখানার একটা গাড়ি নিয়ে তিনি চলে এলেন ষ্টিফেনকোর্টে তাঁর অফিসে।

বিকেল পর্যন্ত সেই গানটা তাঁর সঙ্গ ছাড়লো না। যতই কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করেন, সেই গানটা তাঁর মাথায় ঘুরে ফিরে আসে। এখন তাঁর মনে বদ্ধমূল জন্মে গেছে যে এই গানটা তিনি পুরো শুনেছেন তো নিশ্চয়ই, শুধু তাই নয়, পুরো গানটাই তিনি জানতেন। কিন্তু কার কাছে যে শুনেছেন তা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

অফিস ঘরে সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব বাথরুম। বিকেলে সেখানে ঢুকে তিনি দিব্যি গুনগুনিয়ে গাইতে লাগলেন গানটা:

শহরে ষোলো জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে
তারপর? তারপর?

জ্ঞানব্রত অনুভব করলেন এই গানটার বাকি কথাগুলো না জানতে পারলে তাঁর জীবনে আর সুখ আসবে না। রাত্তিরে ঘুমোতেও পারবেন না তিনি।

কিন্তু এ গান কী করে উদ্ধার করা যাবে? সকালবেলা কোন এক অখ্যাত গায়ক রেডিওতে গেয়েছে এই গান। কে তা শুনেছে বা মনে রেখেছে? অন্তত জ্ঞানব্রত যে জগতে ঘোরাফেরা করেন সেখানকার কেউ শুনবে না এই গান।

ফোন তুলে জ্ঞানব্রত চাইলেন আর সি চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাম্বার!

—রশীদ সাহেব? আমি জ্ঞানব্রত চৌধুরী বলছি। টোকিও থেকে কবে ফিরলেন?

—এই তো পরশু। আপনার জন্য একটা ঘড়ি এনেছি। আমার গরীবখানায় কবে আসবেন বলুন? নেক্সট সানডে?

—না, ঐ রবিবার আমি থাকবো না, পরে হবে একদিন। আপনাকে অন্য একটা দরকারে ফোন করছি। আপনার বাড়ির পার্টিতে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, কলকাতা রেডিও স্টেশনের নতুন স্টেশান ডিরেকটার, কি যেন নাম ভদ্রলোকের?

– এই রে, নাম তো জানিনা আমিও। কেন, খুব দরকার?

—আপনার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন, আপনি তার নাম জানেন না?

—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ ওনার ওয়াইফের খুব বন্ধু। এক সঙ্গে পড়তেন কলেজে। সেইজন্য আপনার ভাবীই নেমন্তন্ন করেছিলেন ওদের দু'জনকে। নামটা বলেছিলেন বটে, এখন ভুলে গেছি।

—আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে নামটা জানা যায় না?

—কেন যাবে না? হঠাৎ রেডিওর স্টেশন ডিরেকটারকে আপনার কী দরকার পড়লো? পাবলিসিটি দেবেন?

—না, না, সে সব কিছু নয়, অন্য একটা দরকার!

দশ মিনিট বাদে রশীদ সাহেব জানিয়ে দিলেন যে রেডিও ষ্টেশনের ঐ পরিচালকটির নাম পি সি বড়ুয়া।

এবার জ্ঞানব্রত চাইলেন রেডিও ষ্টেশন।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রশীদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে, মনে করতে পারছেন তো?

—নিশ্চয়ই। গোল্ডেন স্টার টুথপেষ্ট তো? আমেরিকাতে আমি যখন পড়াশুনো করতুম, তখন থেকেই ঐ টুথপেষ্ট ব্যবহার করি।

—আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার ছিল।

—বলুন।

ঠিক মুহূর্তে সামলে গেলেন জ্ঞানব্রত। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! তাঁর পক্ষে রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টরকে টেলি-ফোন করে হঠাৎ একটা পল্লীগীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা একেবারেই চলে না। মাষ্ট নট ডান।

—আপনি আজ সন্ধেবেলা কি ব্যস্ত আছেন? ক্যালকাটা ক্লাবে একবার আসতে পারবেন?

—ক'টার সময়?

—এই ধরুন সাড়ে সাতটা-আটটা!

—আচ্ছা আসবো। এই ধরুন এইটস! আপনি কোথায়…

—আমি ওপরের বার রুমে থাকবো।

—ঠিক আছে দেখা হবে। আমার স্ত্রী সেদিন বলছিলেন, আপনার স্ত্রীর হাসিটি একেবারে গোল্ডেন স্টার স্মাইল। হাঃ হাঃ হাঃ।

জ্ঞানব্রত চিন্তা করে দেখলেন আজ সারা দিনে তিনি প্রায় কিছুই কাজ করেন নি। কী একটা সামান্য গান তাঁকে একেবারে প্যাগলা করে তুলেছে। আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে পুরো ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

ঐ বোম্বেটে শব্দটা। জ্ঞানব্রতর যেন মনে হচ্ছে এই গানেই তিনি প্রথম বোম্বেটে শব্দটা প্রথম শোনেন। শহরে ষোলোজন বোম্বেটে…এ লাইনটার নিশ্চয়ই অন্য কোন মানে আছে। পুরো গানটা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

সুজাতাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন, আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে।

রেডিও'র ষ্টেশন ডিরেক্টর ক্যালকাটা ক্লাবে আসবেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাঝখানে অনেকটা সময়। জ্ঞানব্রত সাধারণত দু'টোর পর অফিসে থাকেন না। এক একজন লোক দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই অফিসে কাটাতে ভালোবাসে। খুব বেশী কাজের চাপ থাকলে জ্ঞানব্রত ফাইল-পত্র বাড়িতে নিয়ে যান কিংবা ম্যানেজারদের বাড়িতে ডাকেন। তার বাড়িতে এজন্য দু'খানা আলাদা ঘর আছে।

সন্ধ্যের সময় অফিসের বদলে বাড়িতে বসে কাজ করার একটাই কারণ, খুব বেশীক্ষণ সুট টাই মোজা জুতো পায় থাকা পছন্দ করেন না তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব ধড়া-চুড়ো ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী আর চটি পরলেই স্বস্তি।

আজ আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হবে না। এখন বাড়ি ফিরে আবার ক্যালকাটা ক্লাবে আসা একটা ঝক্কির ব্যাপার। জ্ঞানব্রত এখন বেশ লজ্জা পাচ্ছেন। কেন পি. সি বড়ুয়াকে ডাকতে গেলেন। কি বলবেন তিনি ওঁকে? হঠাৎ এরকম ছেলেমানুষী কেন বা চাপলো কে জানে।

চেয়ার ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন জ্ঞানব্রত। সাত তলায় ওপরের এই ঘর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঐতো কাছেই রেডিও স্টেশন। তিনি ইচ্ছে করলেই ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারতেন বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে। কিংবা ওঁকে বলতে পারতেন, অফিস থেকে ফেরার পথে টুক করে দু'মিনিট থেমে যাবেন এখানে। কিন্তু সেটা রীতি নয়। অল্প পরিচিত হোমড়া-

চোমড়া ব্যক্তিদের ক্লাবে ডাকাই নিয়ম।

ডালহাউসি স্কোয়ারের চারপাশ এখন লোকে লোকারণ্য। ওপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বুঝি কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে গেছে। সে সব কিছুই নয়, অফিস ছুটির সময় এ রকম ভিড়ই হয়।

অন্য দিনের মত ঠিক ছ'টার সময় বেরোলেন জ্ঞানব্রত।

সুজাতা বিকেলের দিকে আবার গাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। না দিলেও অসুবিধে ছিল না। অফিসের অন্য যে-কোন একটা গাড়ি নিতে পারতেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়ালো। ভেতরে উঠে বসে তিনি বললেন, ইডেন গার্ডেনের দিকে চলো।

শিক্ষিত ড্রাইভার কখনো বিস্ময় প্রকাশ করে না।

সন্ধ্যের সময় বড়বাবু ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যাবেন, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু সে কোনো কথা না বলে সেদিকেই গাড়ি ঘোরালো।

এক্ষুণি ক্যালকাটা ক্লাবে যেতে চান না জ্ঞানব্রত। সেখানে চেনা-শুনো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। এই সময় যারা যায়, তারা মদ খেতেই যায়। তাঁদের পাল্লায় পড়লে তাঁকেও মদের গ্লাস নিয়ে বসতে হবে। কিন্তু তাঁর মদ খাওয়ার প্রতি বিশেষ ঝোঁক নেই, মাঝে মাঝে দু'তিন পেগ খান বটে। খুব একটা উপভোগ করেন না।

পি. সি বড়ুয়াকে তিনি বার-রুমে আসতে বললেন কেন? খেতে বসলে তো ড্রিংক না নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিছু না ভেবেই তখন বলেছেন। এখন বুঝলেন একটা কারণও আছে। রশীদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে তিনি পি. সি বড়ুয়াকে ঘন ঘন স্কচ নিতে দেখেছিলেন।

ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম গেটটার সামনে গাড়িটা থেমে গেল। জ্ঞানব্রতকে অন্যমনস্ক দেখে ড্রাইভার শুধু বললো, স্যার—।

সময় কাটাবার জন্য ইডেন গার্ডেনে তিনি ঘুরে বেড়াবেন?

সেটা হাস্যকর। ওখানে অল্প বয়েসী ছেলে মেয়েরা যায়। অন্তত পঁচিশ বছরের মধ্যে জ্ঞানব্রত ইডেন গার্ডেনের এই দিকটায় সন্ধেবেলা একবারও আসেননি। ক্রিকেটের সময় দুপুরে আসতেন বটে, তাও সারা দিনের পুরো খেলা কোনোবারই দেখা হয় নি।

তার চেয়ে গঙ্গার ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে হয়। শীতের বেলা, এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জ্ঞানব্রতর মনে পড়লো অনেকদিন তিনি কোনো নদী দেখেন নি।

ড্রাইভারকে বললেন, তুমি এখানে থাকো। আমি আসছি।

স্ট্যান্ডের কাছটায় যে এমন সুন্দর সব ফুলের গন্ধ আর এরকম বাঁধানো রাস্তা হয়েছে জ্ঞানব্রত জানতেনই না। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এমন কি তার বয়সী লোকও রয়েছে।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে জ্ঞানব্রত আপন মনে গুনগুন করে সেই গানটা গাইতে লাগলেন :

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিলে পাগলপারা নিল তারা
সব লুটে…

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন, আমার কি মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল? এ কী গান আমি গাইছি? এ গানটা সারা দিন আমার মাথায় গেঁথে আছে কেন? এর মধ্যে কী যাদু আছে? ট্রেনের ভিখিরি কিংবা বাউল-টাউলরা এরকম গান গায়, এর সঙ্গে গোল্ডেন স্টার টুথপেস্ট কোম্পানীর মালিকের কী সম্পর্ক!

একটু বিরক্ত মুখে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা গাছ-তলায় দাঁড়ালেন।

বড় বড় কয়েকটা জাহাজ আলোকমালায় সাজানো। ছোট ছোট অনেকগুলো নৌকা মোচার খোলার মতন দুলছে, এই মাত্র একটা স্টীমার জলে ঢেউ তুলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে ডেকে চলে গেল। এই গানটার

সঙ্গে জ্ঞানব্রতর ছেলেবেলার কোন যোগ আছে নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রতর খুব ভালো মনে পড়ে না ছেলেবেলার কথা। চোদ্দ বছর তিন মাস বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। তারপর থেকে সব স্মৃতিই খুব স্পষ্ট, কিন্তু বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন তার আগের দিনগুলো যেন হারিয়ে গেছে একেবারে। অথচ সেই সবই ছিল সুখের দিন। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁদের সংসারটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় জ্ঞানব্রতর গাড়ি থামলো ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে।

এখনো তাঁর অন্যমনস্ক ভাবটা যায়নি। কোনো দিকে না তাকিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ প্রায় মুখোমুখি একজন দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বললো, হ্যাল্লো জি! বি! সিয়িং ইউ আফটার আ লং টাইম! একা যে?

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে একটি বেশ দীর্ঘকায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে দেখলেন। তার পাশে এক ছিপছিপে চেহারার তরুণী মেয়ে। পুরুষটিকে চেনেন জ্ঞানব্রত, কনসালটেন্সি ফার্ম আছে। জ্ঞানব্রত ব্যবসা শুরু করার পর গোড়ার দিকে কিছুদিন এর সাহায্য নিয়েছিলেন, এখন বিশেষ যোগাযোগ নেই, তবে তিনি শুনতে পান বাজারে এর অনেক টাকা ধার।

জ্ঞানব্রত ফিকে হাসির সঙ্গে বললেন, কী খবর, পি. সি?

—খবর তো অনেক। আমরা চলে যাচ্ছিলুম··চলুন তাহলে আপনার সঙ্গে আর একটু বসি। জি. বি. আপনি খানিকটা রিডিউস করেছেন মনে হচ্ছে। ইউ লুক ইয়াং।

উঁচু মহলে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। নামের ইংরাজী দু'টি আদ্যক্ষর বলাই রেওয়াজ। জি. বি. পি. সি. আর. এন. পি. কে। যেন মানুষ নয়, কোনো গুপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, পি. সি. নামের লোকটি এরই মধ্যে বেশ খানিকটা নেশা করেছে। ওর সঙ্গে টেবিলে বসে কথা বলার

একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর। কিন্তু লোকটি নিজেই নিজেকে নেমন্তন্ন করেছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, আমার সঙ্গে একজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

অকারণেই হা হা করে হেসে উঠে পি. সি বললো, কোনো গোপন ব্যাপার? কোনো পরস্ত্রী? আমরা সেখানে থাকলে অপরাধ হবে?

তারপর হঠাৎ মনে-পড়া ভঙ্গিতে পি. সি তার পাশের মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, আলাপ করিয়ে দিই, মীট্ মাই কাজিন, এলা। এই মেয়েটির নাম এলা···ইয়ে—মানে—কী যেন পদবী তোমার, কিছুতেই মনে থাকে না।

মেয়েটি বললো, মুখার্জি। এলা মুখার্জি।

পি. সি. নামের লোকটি তার এমনই কাজিনকে সঙ্গে এনেছে, যার পদবীও সে জানে না। আজকাল এরকম কাজে মিথ্যে কথা বলার দরকার হয় না। ঐ পি. সি. যে-কোনো মেয়ের সঙ্গেই ক্যালকাটা ক্লাবে এসে থাক না কেন, তাতে জ্ঞানব্রতর কি আসে যায়?

তলা থেকে আরও লোক আসছে, এই সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। জ্ঞানব্রত ওপরে উঠতে শুরু করতেই পি. সি. আর এলা মুখার্জি এলো সঙ্গে সঙ্গে।

কোণের একটা টেবিলে বসবার পর পি. সি. জ্ঞানব্রতকে বললো, আই উইল হ্যাভ ওয়ান স্কচ অন ইউ। এলা কী খাবে আপনি জিজ্ঞেস করুন। ইউ ক্যান অফার হার হোয়াট এভার ইউ লাইক।

এলা বললো, সে আগে জিন আর লাইম খেয়েছে, এখনও তা-ই খাবে।

বয়কে ডেকে মৃদুকণ্ঠে হুইস্কি, জিন এবং নিজের জন্য মিনারাল ওয়াটার অর্ডার দিলেন জ্ঞানব্রত।

এলার কাঁধে আলগা হাত রেখে পি. সি. বললো, জানো তো

এলা, এই জি. বি. নাও আ ভেরি বীগ্ ম্যান—কিন্তু এক সময় ছিল, আমার কাছে আসতে হতো, আমি ব্যাংক লোন পাইয়ে দিয়েছি। জী. বি. দিই নি? ঠিক বলছি?

পি. সি'র উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। একসময় সে জ্ঞানব্রতর উপকার করেছে। এখন তার প্রতিদান চায়। দু'চার পেগ স্কচ্ খাওয়াবে, এ আর এমন কী! কিন্তু এরকম প্রতিদান যে সে অনেকবার নিয়েছে, তা এলা জানে না।

জ্ঞানব্রত কৃপণ নন্, পি. সি-কে খাওয়াতে তাঁর আপত্তি নেই। তা ছাড়া এই সব খরচই যাবে তাঁর এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে। কিন্তু তিনি জানেন, একবার নেশা হয়ে গেলে, পি. সি. আর থামতেই চাইবে না।

এলা মেয়েটি খুবই সুশ্রী। মুখে বুদ্ধির আভা আছে। পি. সি'র সঙ্গে তার বয়েসের অনেক তফাৎ, অন্তত তিরিশ বছর তো হবেই। এইসব মেয়েকে মদ্যপানের সঙ্গিনী হিসেবে পি. সি. জোগাড় করে কী ভাবে? আর এই সব মেয়েরাই বা আসে কেন?

এলা নিজের হাতব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করলো। দু'টিই বেশ দামী। তারপর জ্ঞানব্রতর দিকে তাকিয়ে একটু লাজুকভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমি আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি?

জ্ঞানব্রত অবাক না হয়ে পারলেন না। তাঁর সামনে মদ খেতে পারে, অথচ সিগারেট ধরাতে লজ্জা, এ আবার কী ধরনের মেয়ে?

জ্ঞানব্রত কিছু বলবার আগেই পি. সি. বলে উঠলো, আরে খাও, খাও! জি. বি. কিছু মনে করবে না। বছরে দু'তিনবার লণ্ডন আমেরিকা যায়। এলা বললো, না আমি ওঁকে আগে থেকেই চিনি কিনা।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? পি. সি. আবার মাঝখানে বলে উঠলো ওকে 'আপনি' বলার কী আছে? জি. বি. ইউ আর

সো ফরমাল…

জ্ঞানব্রতর মনে হলো, এখানে এখন পি. সি. না থাকলেই ভালো হতো। এলা নামের এই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ভালো লাগতো। এক একটি মেয়ে থাকে, যাদের মুখের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, এলা সেই রকম।

—তুমি আমায় আগে থেকে চেনো?

—হ্যাঁ, একবার দেখেছি। আপনি তো উজ্জয়িনীর বাবা! উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমি ব্রেবোর্ণে পড়েছি এক বছর। তখন একবার আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

জ্ঞানব্রত স্পষ্ট টের পেলেন, তাঁর শরীরটায় ঝনঝন শব্দ হলো। এই মেয়েটি তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীর সহপাঠিনী? পি. সি'র মতন একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে ঘোরে। তাঁর সামনে বসে মদ খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে তাঁর মেয়ের বান্ধবী, উজ্জয়িনীর কত বয়েস? কয়েক মাস আগেই ওর কুড়ি বছরের জন্মদিন গেল না? এই মেয়েটির বয়েসও তা হলে কুড়ি একুশ। তবে কি উজ্জয়িনীও অন্য কোথাও অন্য কারুর সঙ্গে এইভাবে…না না তা হতেই পারে না!

দু'এক মুহূর্ত আগে জ্ঞানব্রত ছিলেন পুরুষ মানুষ, এখন হয়ে গেলেন বাবা। তাঁর মেয়ের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হতে লাগলো, উজ্জয়িনী অনেক স্বাধীন হয়ে গেছে, যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়…জ্ঞানব্রত তেমন খবর রাখতে পারেন না।

এলা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, উজ্জয়িনী এখন এম. এ পড়ছে না? আমি আর এম. এ-টা পড়লুম না!

তৎক্ষণাৎ সস্তা রসিকতার সুরে পি. সি. বললো, তার বদলে প্রেমে পড়ে গেলে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জ্ঞানব্রত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। এলার দিকে তিনি আর তাকাতেও পারছেন না।

এলা বললো, কলেজে আমরা একবার 'তাসের দেশ' করেছিলুম,

উজ্জয়িনী হরতনী সেজেছিল, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন?

জ্ঞানব্রত দু'দিকে মাথা নাড়ালেন।

—আমি হরতনীর গান গেয়েছিলুম পেছন থেকে।

পি. সি. বললো, খুব ভালো গান গায়। জি. বি'র অবশ্য গানটান শোনার সময় নেই, মেকিং মানি অল দা টাইম—

গান কথাটা শোনামাত্র জ্ঞানব্রতর আবার মনে পড়লো সেই লাইনগুলো—শহরে ষোলোজন বোম্বেটে – করিয়ে পাগলপারা—নিল তারা সব লুটে—।

পি. সি বললো, বাংলা সিনেমায়, রেডিওতে আজকাল যা বাজে বাজে গান হয়, সেই তুলনায় এলা···শি ইজ আ ওয়াণ্ডার···এমন চমৎকার গলা?

—চুপ করো! তুমি বড় বাড়িয়ে বলছো।

জ্ঞানব্রত মুখ তুলে তাকালেন। এলা তুমি বলে কথা বলে পি. সি'র সঙ্গে। এই মেয়েটির পশ্চাৎপটটা তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসও তাঁর নেই।

পি. সি'র গেলাস খালি হয়ে গেছে। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই সে বললো, হ্যাঁ দাও, আর একটা!

এলা আর নিতে চাইলো না। সে বললো, আমি এবার উঠবো। তা ছাড়া উনি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন, আমরা শুধু শুধু ডিসটার্ব করছি ওঁকে—

এক্ষেত্রে ভদ্রতা করে জ্ঞানব্রতর বলা উচিত, না না, সে রকম কোনো ব্যাপার নয় ইত্যাদি। কিন্তু সে সুযোগও তিনি পেলেন না, তার আগেই পি. সি. বলে উঠলো, আরে যাঃ। জি. বি-কে কি আমি আজ থেকে চিনি? কতকালের সম্পর্ক! সার্টেইনলি হি ওন্ট মাইণ্ড···তোমার মত একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখেও বিরক্ত হবে, কী, জি. বি?

জ্ঞানব্রত বললেন, মাই প্লেজার!

পরের গেলাসে দু'চুমুক দিয়েই পি. সি. বললো, আমি একটু

আসছি। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

এবার জ্ঞানব্রত আর এলা মুখোমুখি। জ্ঞানব্রত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

—আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না।

জ্ঞানব্রত একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ?

—আপনার মাথায় এত চুল, একটাও পাকে নি।

—ও, বয়েস!

—এখনো খুব ইয়াং আছেন!

এলার হাসিটা দেখে আরও চমকে উঠলেন জ্ঞানব্রত। কম বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেলামেশার অভ্যেস না থাকলেও এ হাসি দেখলে চিনতে ভুল হয় না। প্রশ্রয়ের হাসি। পি. সি'র অনুপস্থিতিতে এলা তাঁকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে। তাঁর নিজের সমবয়েসী একটি মেয়ে…

জি. ই. সি কোম্পানীর চৌধুরী এই সময় বার-রুমে ঢুকে জ্ঞানব্রতকে দেখে কথা বলার জন্য এগিয়ে এসে থমকে গেলেন হঠাৎ। তারপর দ্রুত চলে গেলেন উনি। এরকম ভর সন্ধেবেলা ক্যালকাটা ক্লাবে কোনো যুবতী মেয়েকে নিয়ে মদের টেবিলে বসে থাকবেন জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী, এ রকম যেন কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

জ্ঞানব্রত মনে মনে একটু হাসলেন। চৌধুরী বোধহয় ভাবলেন, হঠাৎ রাতারাতি তার চরিত্র পালটে গেছে।

কী মুস্কিল, পি. সি আসছে না কেন ? বাথরুম করতে এত দেরী হয় ? নিশ্চয়ই আর কারুর সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে।

কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়, তাই জ্ঞানব্রত কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাকো ?

—গোল পার্কে। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে।

—হোস্টেলে ? তুমি চাকরি করো ?

—করতাম। এখন করি না।

পর মুহূর্তেই এলা ঝরঝর করে হেসে বললো ভয় নেই, আপনার কাছে চাকরি চাইবো না। আপনার গান বাজনা নিয়ে থাকার ইচ্ছে। আপনি গান ভালোবাসেন না?

—খুব যে ভালোবাসি কিংবা বুঝি, তা বলতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে শুনি।

—সামনের সপ্তাহ থেকে যে হাফেজ আলীর নামে কনফারেন্স হচ্ছে, তাতে যাবেন? আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

একটু গম্ভীর হয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সামনের সপ্তাহে আমার কলকাতায় থাকা হবে না। বোম্বে যেতেই হবে।

—বাবা! আপনারা সব সময় এত ব্যস্ত!

—তুমি কী গান করো? পল্লীগীতি কিংবা পুরানো বাংলা গান জানো?

—ফোক সঙ্? না ওসব আমি করি না…আমি নজরুল-অতুল প্রসাদের গান…রবীন্দ্র সঙ্গীতও শিখেছি। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের এত আর্টিস্ট যে চান্স পাওয়া যায় না।

এবার রেডিও স্টেশনের বড়ুয়া দরজা দিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। জ্ঞানব্রত হাত তুললেন।

বড়ুয়া এলার দিকেই তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। বড়ুয়া ও জ্ঞানব্রত প্রায় সমবয়েসীই মনে হয়, মাথার চুলে কিছু পাক ধরেছে। কিন্তু জ্ঞানব্রতর তুলনায় বড়ুয়া অনেকটা ছটফটে ধরনের মানুষ। এদের আদি বাড়ি চট্টগ্রামে, তবে এখন নিজেকে অসমীয়া বলে পরিচয় দেন।

পাক্কা সাহেবের মতন সুট-টাই পরা বড়ুয়ার। বসেই কোটের দু'পকেট থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, আই অ্যাম স্লাইটলি লেট—আটটা দশ—এই যাঃ! সিগারেট আনতে ভুলে গেলাম!

টেবিলের ওপর এলার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পড়ে আছে। বড়ুয়া ধরেই নিলেন সেগুলো জ্ঞানব্রতর। তিনি সেদিকে অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়াতেই জ্ঞানব্রত বললেন, আমি সিগারেট

আনিয়ে দিচ্ছি, আপনার কী ব্র্যাণ্ড ?

এলা বললো, নিন না !

এবার আলাপ করিয়ে দিতে হয়। জ্ঞানব্রত বললেন, ইনি মিস এলা মুখার্জী, গান করেন, আর ইনি এন সি বড়ুয়া কলকাতা রেডিওর…

বড়ুয়ার চোখে বেশ খানিকটা কৌতূহল ফুটে উঠলো। তিনি একবার এলার মুখের দিকে, একবার জ্ঞানব্রতর দিকে তাকাতে লাগলেন। ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না।

এরকম অদ্ভুত অবস্থায় জ্ঞানব্রত কখনো পড়েন নি। ঝোঁকের মাথায় বড়ুয়াকে তিনি এখানে ডেকেছিলেন। বড়ুয়া নিশ্চয়ই একটা কিছু কারণ জানতে চাইবেন। অন্তত মনে মনে। কিন্তু কী কারণ দেখাবেন জ্ঞানব্রত ? যা বলতে চান তাও এখন বলা যাবে না। এলাকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। এলা গান গায়। বড়ুয়া হয়তো ভাববেন এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যই তাঁকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মেয়েটিকে যে জ্ঞানব্রত পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও চিনতেন না। তা কি বিশ্বাস করবেন ?

এরপরই এসে পড়লো পি. সি।

জ্ঞানব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলা হবে না, কোন কথাই বলা হবে না আজ। অনাবশ্যক অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছেন।

তাঁর ইচ্ছে হলো, কারুকে কিছু না বলে হঠাৎ এখান থেকে উঠে চলে যেতে।

সে রাতে জ্ঞানব্রত বাড়ি ফিরলেন এগারোটারও পর এবং বেশ মাতাল অবস্থায়। এটা একটা অভিনব ঘটনা।

সুজাতা অবাক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিলিতি শিক্ষা অনুযায়ী মুখে সে ভাব ফোটালো না। কোনো এক ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকের লেখায় সুজাতা পড়েছিল যে, যারা প্রকৃত লেডী, তারা কোন কিছুতেই চট্ করে অবাক হয় না।

কেন দেরী হলো, কাদের সঙ্গে ছিল এসব কিছুই জিজ্ঞেস

করলো না সুজাতা। শুধু জানতে চাইলো, তুমি কি রাত্রে আর কিছু খাবে?

জ্ঞানব্রতর চক্ষু দুটি লাল, চুল এলোমেলো, টাইয়ের গিঁট আলগা। সারা মুখে একটা জ্বলজ্বলে ভাব। মাথা নেড়ে বললেন, না।

স্বামী স্ত্রীর একই শয়নকক্ষ বটে কিন্তু আলাদা দু'টি খাট। ঘরটি বেশ বড়। খাট দু'টি দু'দিকের দেয়ালে পাতা। এই ব্যবস্থা এই জন্য যে সুজাতা অনেক রাত জেগে উপন্যাস পড়তে ভালো-বাসে। জ্ঞানব্রত ঘুমিয়ে পড়েন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় এবং চোখে আলো তাঁর সহ্য হয় না। সুজাতার খাটের সঙ্গে একটা ছোট্ট আলো লাগানো আছে বই পড়বার জন্য।

সুজাতা বললো, তুমি অ্যাসপিরিন বা অ্যান্টাসিড জাতীয় কিছু ওষুধ খাবে?

জ্ঞানব্রত প্রথমে দু'দিকে ঘাড় নাড়লেন। তারপর এক মুখ হেসে শিশুর মতন আবদারের গলায় বললেন, একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। দেবে?

এতেও বিস্মিত ভাব দেখালেন না সুজাতা।

আজ এরকম পরপর নিয়মের ব্যতিক্রম করছেন জ্ঞানব্রত।

এক সময় তাঁর মুখে সিগারেট কিংবা চুরুট সব সময় লেগে থাকতো। সাত মাস আগে একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার অবশ্য অনেক পরীক্ষা করেও হার্টের কোনো রোগ ধরতে পারেন নি। তবে সাবধান হওয়া ভালো। সিগারেট চুরুট এসব ছাড়া দরকার।

সিগারেটের অভ্যেস ছাড়া পৃথিবীর বহু লোকের পক্ষে খুব শক্ত হলেও জ্ঞানব্রতর কাছে কিছুই না। সেই যে চুরুটের বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়, তারপর থেকে এই সাত মাসের মধ্যে একবারও ভুলেও ধূমপানের ইচ্ছে প্রকাশ করেন নি। তাঁর যেমন কথা, তেমন কাজ।

এক সময় মুখে দুটো সিগারেট এক সঙ্গে নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে জ্ঞানব্রত তার একটা দিতেন সুজাতাকে। বিয়ের পর কিছু-দিন রাত জেগে গল্প করার সময় দু'জনে পাশাপাশি বসে এক প্যাকেট সিগারেট উড়িয়ে দিতেন।

সুজাতা সিগারেটের অভ্যেস ছাড়তে পারে নি।

স্বামীর দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আই থিংক, ইউ বেটার নট।

—খাই না একটা!

আগেকার মতন আর এক সঙ্গে দুটো সিগারেট জ্বালালেন না জ্ঞানব্রত। শুধু নিজেরটা ধরিয়ে বললেন, আজ একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে। একটা গানের কটা লাইন এমন মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। এমন কি এতখানি মদ গিলে ফেললুম, তাও যাচ্ছে না!

—কী গান?

একটা হেঁচকি উঠতেই প্রথমে মুখে হাতচাপা দিয়ে জ্ঞানব্রত বললেন, সরি। তারপর উঁ উঁ করে সুর ভেঁজে গেয়ে উঠলেন ঃ

শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে—
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরেরও সে শিরোমণি…

এমনিতেই জ্ঞানব্রতর গলায় খুব একটা সুর নেই, মাতাল অবস্থায় তার গলাটা আরও মজার শোনাচ্ছে।

সুজাতা হেসে ফেলে বললো, বাঃ বেশ গানটা তো!

—পরের লাইনগুলো মনে পড়ছে না।

—এটা কার গান?

—কী জানি। আমি কি গান বাজনার কোনো খবর রাখি? তবু এই একটা অদ্ভুত গান যে কেন মাথায় ঢুকে গেল…

—এবার শুয়ে পড়ো, ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জ্ঞানব্রত ধড়াচুড়ো ছেড়ে রাত্রের শোবার পোশাক পরতে লাগলেন। যথেষ্টই নেশা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর পা কেঁপে যাচ্ছে।

—আচ্ছা সুজাতা তুমি এই গানটা আগে কখনো শুনেছো?

—না!

অথচ আমার মন বলে আমি আগে এটা অনেকবার শুনেছি। তা কী করে সম্ভব?

সুজাতার খাটের ওপর একটা বই অর্ধেক উল্টোনো। বেলজিয়ান লেখক জর্জ সিমেনো'র সে নিদারুণ ভক্ত। গোয়েন্দা উপন্যাসের অর্ধেকটা যার পড়া হয়েছে, তার কেন সেই সময় একটা আজেবাজে গান সম্পর্কে আলোচনা শুনতে ভালো লাগবে?

—তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আসছি! সুজাতা চলে গেল বাথরুমে।

টুথপেষ্ট কোম্পানি মালিকের স্ত্রী বলেই নয়, রাত্রে শোবার আগে দাঁত ব্রাসকরা সুজাতার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। টুথপেষ্ট কোম্পানির মালিক স্বয়ং অবশ্য রাত্রে দাঁত মাজেন না। শুধু তাই নয়, দাঁত মাজার পর টুথপেষ্টের গন্ধমাখা মুখে চুমু খেতেও তাঁর ভালো লাগে না। সুজাতা তাঁর স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আজ আর তাঁর চুমু খাওয়ার কোনো বাসনা নেই।

সুজাতা ফিরে এসে দেখলো জ্ঞানব্রত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন জানলার কাছে।

—প্রায় বারোটা বাজলো, তুমি ঘুমোবে না?

—হ্যাঁ, এবার শুচ্ছি। অনেক দিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় নি। চলো, এবার কোনো গ্রামে বেড়াতে যাই। যাবে?

—তুমি যে বলেছিলে সামনের দু' তিন মাসে তোমার খুব বেশী কাজ? হায়দ্রাবাদে একটা ফ্যাক্টরি খোলা হবে···

—হ্যাঁ, কাজ আছে তো বটেই···কিন্তু মন টানছে এমন কোথাও যাই, যেখানে সবুজ গাছপালা, একটা বেশ নির্জন নদী।

সুজাতার কাছে গ্রাম মানে ট্রেনের দু'ধারের দৃশ্য। শান্তি-

নিকেতনের চেয়ে কোনো ছোট জায়গায় সে জীবনে থাকে নি। সাদা টালি বসানো বাথরুম যেখানে নেই, সে সব জায়গা সুজাতার পক্ষে বাসযোগ্যই নয়। সুজাতার রূপ এবং সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই এই ভাবটা রয়েছে যে, এই পৃথিবীতে সে অবিমিশ্র সুখ ভোগের জন্যই এসেছে।

কেনই বা সুখ ভোগ করবে না। একটাই তো জীবন।

—তুমি যদি সময় করতে পারো, চলো তা হলে একবার শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে আসি। চুমকিও বলছিল ··

—আগেরবার শান্তিনিকেতন গিয়ে তোমার ভালো লাগে নি।

যা গরম ছিল সেবার। টুরিষ্ট লজের যে ঘরটা আমাদের দিয়েছিল, এয়ারকুলারটা কোন কাজ করছিল না।

—হা-হা-হা-হা।

জ্ঞানব্রত কাছে এগিয়ে এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরলেন। সুজাতা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেই তিনি বললেন, না না, ভয় নেই, চুমু খাবো না, তুমি কি সুন্দর, সুজাতা! তুমি স্বর্গের মানুষ। এই পৃথিবীর নও; গুড নাইট!

নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেও তক্ষুণি ঘুম এলো না জ্ঞানব্রতর। ক্যালকাটা ক্লাবের সন্ধ্যেটার কথা মনে পড়তে লাগলো। এলা নামের মেয়েটি কী অদ্ভূত! তার মেয়ের প্রায় সমান। চুমকির সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছে। সেই মেয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে মদ খায় না, শুধু স্পষ্ট তাকে সিডিউস করার চেষ্টা করেছে। চকচকে স্থির দৃষ্টি মেলে ঠোঁটটা কাঁপাচ্ছিল।

এলার ব্যাপারটা সুজাতাকে বলা হয়নি বলে জ্ঞানব্রত একটু অপরাধীবোধ করছেন। স্ত্রীর কাছে কোন কিছু লুকানো তাঁর স্বভাব নয়! তাঁর কোনো গোপন জীবন নেই। থাক, পরে বললেও চলবে।

মাঝরাতে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন জ্ঞানব্রত। তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। এখনো স্বপ্নের ঘোর কাটেনি।

তারপর ভালো করে চোখ মেলে দেখলেন সুজাতার খাটে তখনও আলো জ্বলছে, আর কয়েক পৃষ্ঠা বাকি বইটার। সুজাতা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

জ্ঞানব্রত বললেন, লালন ফকির ?

শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়ে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার উঠলে যে, জল খাবে ?

জ্ঞানব্রত বললেন, এবার মনে পড়েছে। ওটা লালন ফকিরের গান

এবার সুজাতা অবাক না হয়ে পারলো না। সামান্য একটু ভুরু তুলে বললো, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঐ গানটার কথা ভাবছো ?

—হ্যাঁ, একটি স্বপ্ন দেখলুম—ছেলেবেলায় এই গানটা আমি প্রায়ই শুনতুম এক বুড়োর মুখে···আমি জানি এটা লালন ফকিরের গান···

সুজাতা অনেকগুলো বছর বিদেশে কাটিয়েছে। বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। তবে ফ্যাসান অনুযায়ী সে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে উপযুক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ফিল্ম দেখে। লালন ফকিরের নামও সে শোনে নি। কখনো কোথাও শুনে থাকলেও তার মনে ঐ নাম কোনো রেখাপাত করে না।

কোনো কথা না বলে সুজাতা অপেক্ষা করে রইলো। হলোই বা একটা বিদঘুটে, গেঁয়ো গান লালন ফকির নামে কোনো এক-জনের লেখা বা সুর দেওয়া, কিন্তু তাই নিয়ে মাঝ রাতে ঘুম ছেড়ে আলোচনা করতে হবে ? এটা তো ঠিক স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জি তো কখনো এরকম করেন না।

—আমি বাজি ফেলে বলতে পারি এটা লালন ফকিরের গান।

—তুমি কার সঙ্গে বাজি ধরতে চাইছো ?

এতক্ষণে পুরোপুরি ঘোর কাটল। সত্যিই তো, তিনি প্রায় পাগলের মতন ব্যবহার করছেন।

উঃ হোঃ! তোমায় ডিস্টার্ব করলুম। কত রাত হলো, তুমি এখনো ঘুমোও নি?

—আমি আর তিন চার পাতা শেষ করবো।

আর আধ ঘণ্টা পরে একই ঘরের দু'টি খাটে দু'জন নারী পুরুষ দু'রকম দু'টি স্বপ্ন দেখলো। একজন প্যারিসের মমাত অঞ্চলের, যেখানে ইন্সপেক্টর মেইগ্রে এই মাত্র এক কোটিপতি বাউন্ডুলেকে স্ত্রী হত্যার দায়ে গ্রেফতার করলেন। আর একজন দেখলো বাংলার এক অতি সাধারণ পাড়াগাঁর। সেখানে দু'তিনটি শিশু লুকোচুরি খেলছে এক আম-বাগানে।

পরদিন সকালে ঠিক সেই ছটাতেই ঘুম ভাঙলো জ্ঞানব্রতর। রুটিন মেলানো প্রত্যেকটি কাজ করে যেতে লাগলো। তবু মনের মধ্যে একটা অস্থির অস্থির ভাব। খেতে বসবার আগে সাতটি টেলিফোন এবং তিনজন দর্শন প্রার্থীর সঙ্গে কাজের কথা বলতে হলো তাঁকে তবু সেই ছটফটানিটা গেল না।

খাবার টেবিলে সুজাতা ঘুম ভেঙে উঠেই ছুটে এলো যথা-রীতি। উজ্জয়িনীও আজ এই সময় ব্রেক ফাস্ট খেতে টেবিলে এসে বসেছে। মেয়েকে আজ একটু বেশী করে লক্ষ্য করতে লাগলেন জ্ঞানব্রত।

এই উজ্জয়িনীরই সহপাঠিনী এলা। উজ্জয়িনী বলেছে রবি-বারে ব্যান্ডেলে পিকনিক করতে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সত্যি ব্যান্ডেলে যাবে, না কোনো হোটেলে গিয়ে মদ খাবে, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে ওর কি এর মধ্যেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে? না না, সব মেয়ে এক রকম হতে পারে না।

—তুই এলা নামে কারুকে চিনিস?

মা আর মেয়ে দু'জনেই অবাক হলো। সুজাতার মুখে অবশ্য তার কোনো রেশ নেই, কিন্তু উজ্জয়িনী তো এখনো ঠিক লেডী

হয় নি, তাই সে বেশ চমকে গেল। তার বাবার মুখ থেকে এই ধরনের প্রশ্ন সে এই প্রথম শুনলো।

—এলা? কোন এলা?

—সরকার না চ্যাটার্জি কী যেন বললো পদবীটা ঠিক মনে নেই। তোর সঙ্গে ব্রেবোর্নে কোনো এক বছরে পড়েছে।

—এলা কে? না তো। ঐ নামে তো কাউকে মনে করতে পারছি না। ভালো নাম কী?

—এটাই নিশ্চয়ই ভালো নাম, আমাকে শুধু ডাক নাম বলবে কেন? বললো যে একবার নাকি আমাদের এ বাড়িতেও এসেছে?

—তুমি তাকে কোথায় দেখলে?

—ক্যালকাটা ক্লাবে···আমার একজন চেনা লোকের কাজিন হয় বললো। আমাকে আগে দেখেছে, তোর খুব চেনা।

আমাকে—ও, এলা। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি, মোটে এক বছর পড়েছিল, তারপর তো অনেকদিন আর দেখি নি।

—তোরা ব্যাণ্ডেল যাচ্ছিস এই রোববার?

—হ্যাঁ। বাবা, তোমার গাড়িটা দেবে সেদিন?

—ক'জন যাবি? ইচ্ছে করলে কারখানার একটা স্টেশন ওয়াগন নিতে পারিস।

—আমরা ছ'জন। অ্যামবাসাডরেই হয়ে যাবে।

—ড্রাইভার চাই? না তোর বন্ধুদেরই কেউ চালাবে?

সুজাতা বললো, না, না, ওরা বড্ড জোরে চালায়···জ্ঞান সিং থাকুক ওদের সঙ্গে···

উজ্জয়িনী একবার তাকালো মায়ের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, মা! তুমি কেমন আস্তে গাড়ি চালাও?

একথা ঠিক, সুজাতার হাতে ষ্টিয়ারিং পড়লে আর রক্ষা নেই। ইউরোপের ট্রাফিক আর কলকাতার ট্রাফিক যে এক নয়, সে কথা তার মনে থাকে না। দু'বার ছোট-খাটো অ্যাকসিডেন্টও করেছে, তবু সুজাতা কম স্পীডে গাড়ি চালাতে পারে না।

সুজাতা বললো, আমি তো ঐজন্যই এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছি।

জ্ঞানব্রত বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করলেন। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তিনি মিথ্যে সন্দেহ করছিলেন। চুমকির মুখটা কত সরল, মোটেই ও এলার মত নয়। বাড়ির গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে নির্দোষ পিকনিকে।

কারখানা থেকে অফিসে আসবার পর তিনি রেডিও ষ্টেশনে ফোন করলেন। মিঃ বড়ুয়া, আমি জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী। আজ আবার আপনাকে একটু ডিসটার্ব করছি।

—মিঃ চ্যাটার্জী? বলুন, বলুন লাষ্ট ইভনিং ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল। খুব জমেছিল—ঐ মেয়েটি আজ সকালে দেখা করতে এসেছিল আমার কাছে।

—কোন মেয়েটি!

—ঐ যে এলা সরকার রেডিওতে চান্স চায়– আপনার রেফারেন্সে এসেছে যখন, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী মাঝপথে বাধা দিতে গেলেও বড়ুয়া সাহেব থামলেন না।

—জানেনই তো মিঃ চ্যাটার্জী আমাদের এখানে কিছুকিছু ফর্মালিটি তো আছেই, আমি নিজে গানটান খুব একটা বুঝি না, ওকে একবার অডিশান দিতে হবে—আমাদের একটা মিউজিক বোর্ড আছে—তবে হয়ে যাবে, ওর ঠিক হয়ে যাবে, দেখলেই বোঝা যায় ট্যালেণ্টেড, আপনি নিশ্চিত থাকুন, এজন্য আর ফোন করবার দরকার ছিল না।

জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বলতে চাইলেন যে তিনি এলা নামের ঐ মেয়েটিকে মোটেই পাঠান নি। এবং তার জন্য ফোনও করছেন না। মেয়েটা দারুন কেরিয়ারিষ্ট তো! কালকের আলাপের সুযোগ নিয়ে আজ সকালেই বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করেছে!

কিন্তু এসব কথা তিনি টেলিফোনে বললেন না। এলা মেয়ে-

টিকে তিনি পাঠান নি ঠিকই। তবে ঐ মেয়েটি যদি এইভাবে রেডি-ওতে গান গাইবার সুযোগ পায় তাতে তিনি বাধাই বা দেবেন কেন ? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ও যা পারে করুক।

—মিঃ বড়ুয়া, আমি ফোন করছি আরও একটা কারণে···কাল সন্ধ্যেবেলা এই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভেবেই—শেষ পর্যন্ত আর বলাই হলো না—হয়তো আপনি মনে করবেন খুবই পিকিউলিয়ার রিকোয়েস্ট।

—কী ব্যাপার ? আপনি এত হেজিটেট করছেন কেন ?

—এটা আমার বাতিকও বলতে পারেন। কাল সকাল দশটা আন্দাজ, না ঠিক দশটাই হবে। একজন একটা পল্লীগীতি গাই-ছিল। সেই গায়কের নামটা আমি জানতে চাই। বেতার জগতে নাম ছাপা নেই, আমি এক কপি বেতার জগৎ কিনে দেখলুম আজ।

- কোন চ্যানেল !

—মানে !

—শর্ট ওয়েভে ? বিবিধ ভারতী ?

—তা জানি না। ইন ফ্যাক্ট রেডিও বাজছিল পাশের বাড়িতে ···গানের লাইনগুলো ছিল এই রকম ঃ

শহরে ষোল জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগল পারা···

গানটি শুনে বড়ুয়া সাহেবও যে রীতিমতন অবাক হয়েছেন, তা টেলিফোনের এ পাশ থেকেও বোঝা যায়। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন কী গান ? বোম্বাই ? বোম্বাই শহরে। দাঁড়ান, দাঁড়ান, লিখে নিই।

তারপর তিনি বললেন, এই গানের গায়কের নাম আপনি জানতে চান ?

—হ্যাঁ। সম্ভব হলে তার বাড়ির ঠিকানাও।

···নো প্রবলেম। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনাকে।

রিং ব্যাক করে জানিয়ে দিচ্ছ।

এ দেশে যাদের নামের সঙ্গে সাহেব যুক্ত থাকে, তারা অন্তত একটা ব্যাপারে সাহেবদের মতন নন। তাঁদের পনেরো মিনিট মানে দেড় ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টা বাদে বড়ুয়া সাহেব ফোন করে জানালেন যে ঐ গানের গায়ক একজন আনকোরা নতুন শিল্পী, তার নাম শশীকান্ত দাস। ঠিকানাটা এই…।

ঠিকানাটা কাগজে লিখতে লিখতে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলেন, এই জায়গাটা কোথায় ?

বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তা কী করে জানবো বলুন, উনিতো কখনো আমাকে ওঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেন নি! কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি এই লোকটিকে নিয়ে কী করবেন ?

—ওঁর কাছ থেকে গানটা শিখবো! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বড়ুয়াকে আর কোনো কথা না বলতে দিয়ে জ্ঞানব্রত ফোন রেখে দিলেন।

আজ সারা পৃথিবীতে তাঁর যত কাজই থাক, তবু একবার এই শশীকান্ত দাসের সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

রেডিও ষ্টেশনের পি, সি, বড়ুয়া যে ঠিকানাটি দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি খুঁজে বার করতে খুব বেশী অসুবিধে হলো না। বাগবাজারের কাছে একটা গলির মধ্যে মেসবাড়ি। এটা যে মেস-বাড়ি, তা দরজা দিয়ে ভেতরে এক পা বাড়ালেই টের পাওয়া যায়। এইসব বাড়িতেই একটা উগ্র পুরুষ গন্ধ থাকে।

অনেক কালের বাড়ি, সিঁড়িগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, রেলিং নড়বড়ে। দোতলার বারান্দায় একটা তারে নানান রঙের লুঙ্গি শুকোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত এসেছেন সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু এখনো এ বাড়ির বাসিন্দারা সবাই ফিরে আসে নি। চুপচাপ, খালি খালি ভাব, সদর দরজাটা হাট করে খোলা, একতলাতে একজনও লোক নেই। জ্ঞানব্রত

একটু ক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

মাঝপথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। লোকটির গায়ের রং মিশমিশে কালো, রোগা-লম্বাটে চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। লোকটি পরে আছে শুধু একটা গামছা।

তাকে এই মেসের কোনো ভৃত্য কিংবা রান্নার ঠাকুর মনে করে জ্ঞানব্রত জিজ্ঞেস করলো, ওহে, শশীকান্ত দাস কোন ঘরে থাকেন, বলতে পারো?

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ে তাকালো জ্ঞানব্রতর দিকে।

তারপর আমতা আমতা করে বললো; আজ্ঞে···আমিই শশীকান্ত···।

জ্ঞানব্রত একটু হাসলেন। তিনি এমন কিছু অন্যায় করেন নি। এই ঘটনার আরও অনেক ক্লাসিক উদাহরণ আছে। বঙ্কিম-চন্দ্রকে খালি গায়ে দেখে একজন আগন্তুক জিজ্ঞেস করেছিল, ওহে, বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন কি না বলতে পারেন? বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল সম্পর্কেও এ রকম গল্প আছে। তবু বঙ্কিমবাবু ছিলেন সুপুরুষ। বিদ্যাসাগর বা মাইকেলের তুলনায় এই লোকটিকে বেশ সুদর্শনই বলতে হবে। গায়ের রং কালো হলেও ছিপছিপে মেদ-বর্জিত শরীর। ভাল করে মেকাপ দিয়ে, মাথায় একটা পালকের মুকুট পরিয়ে দিলে অনায়াসেই যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুর সাজানো যায়।

জ্ঞানব্রত বললেন, ও, আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

লোকটির বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। জ্ঞানব্রতর চেহারায়, ব্যক্তিত্বে ও পোশাকে বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ব্যাপার আছে। এই রকম মানুষ সচরাচর শশীকান্ত দাসের মতন লোকের কাছে যেচে দেখা করতে আসে না।

শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে আমি তো আপনাকে স্যার ঠিক চিনতে পারলাম না…।

জ্ঞানব্রত বললেন, আগে তো আলাপ হয় নি, চিনবেন কী করে ? আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

দরকারের কথা শুনে শশীকান্ত আরও বিভ্রান্ত। তার বুকের মধ্যে একই সঙ্গে দারুণ বিপদের ভয় কিংবা দারুণ কোনো সুসংবাদের আনন্দের জোয়ার-ভাটা চলছে।

—আমার সঙ্গে স্যার আপনার দরকার…বলুন স্যার।

জ্ঞানব্রতর হাব-ভাব খুব বেশী সাহেবী ধরনের। বছরে দু' তিনবার তাঁকে ইউরোপ-আমেরিকা যেতে হয়। তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে রাখেন, কখনো একটু কাশতে হলে মুখের সামনে হাত চাপা দেন। প্রকাশ্যে কোনোদিন তিনি হাই তোলেন নি কিংবা হেঁচে ফেলেন নি। খাওয়ার পর ঢেকুর তোলা তার কাছে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

সেই রকমই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাজের কথা বলাও তাঁর পক্ষে একটা চরম অভদ্রতার ব্যাপার।

—আপনার ঘর কোনটা ?

—ঐ যে স্যার, সিঁড়ির ডানপাশেই সাত নম্বর।

—আপনি আমায় মিনিট দশেক সময় দিলে আপনার ঘরে বসে একটু কথা বলতুম।

—নিশ্চয়ই স্যার, চলুন স্যার।

শশীকান্তর সঙ্গে সিঁড়ির দুতিন ধাপ ওঠার পর জ্ঞানব্রত আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি স্নান করতে যাচ্ছিলেন ?

হ্যাঁ স্যার। সকালে জল পাওয়া যায় না, সবাই অফিস যায়, দশটার মধ্যেই চৌবাচ্চা খালি…তাই আমি বিকেলেই…

—ঠিক আছে। আপনি স্নান করে আসুন, আমার তাড়া নেই। আমি আপনার ঘরে অপেক্ষা করছি।

—না, না, স্যার, আমি পরে চান করবো। একদিন চান না

করলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু জ্ঞানব্রতর পক্ষে গামছা পরা খালি গায়ে একজন লোকের দিকে সামনাসামনি তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। তাঁর রুচিতে বাধে।

এবার তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, না, এখনি আগে স্নান সেরে আসুন!

শশীকান্ত তবু ওপরে উঠে এসে সাত নম্বর ঘরের তালা খুলে, দরজাটা হাট করে বললে, আপনি ভেতরে বসুন তবে, স্যার, আমি দু'মিনিটের মধ্যে চান করে আসছি।

লোকটি বুদ্ধি করে এবার একটি লুঙ্গি ও জামা সঙ্গে নিয়ে গেল।

শশীকান্তর ব্যবহারে এরমধ্যেই জ্ঞানব্রত একটু দুঃখিত হয়েছেন। ও একজন গায়ক, একজন শিল্পী, ও কেন একজন অচেনা লোকের সঙ্গে এমন স্যার স্যার বলে কথা বলবেঃ সব শিল্পীরই আত্মাভিমান থাকা উচিত।

ঘরখানা স্যাঁতসেতে, অন্ধকার। এরকম ঘরে জ্ঞানব্রত চ্যাটার্জী বহুদিন ঢোকেন নি। এরকম অস্বাস্থ্যকর ঘরেও মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকে তাই না? তারাও হাসে, স্ফূর্তি করে এবং ভবিষ্যৎ কালে মানুষদের জন্ম দেয়!

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি খাট, তার মধ্যে দুটি খাটের বিছানা গোটানো। অন্য বিছানাটি পাতাই রয়েছে। তার চাদরটা তেল চটচটে। সম্ভবত ঐ বিছানাটা শশীকান্তর। দেয়ালে দুটি ক্যালেণ্ডার ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। অন্ধকারটা একটু চক্ষে সইতে জ্ঞানব্রত দেখতে পেলেন, দুদিকের দেয়ালে দুটি আলনাও রয়েছে, তাতে জামা-কাপড় ডাঁই করা।

একটি বিছানা গুটোনোখাটে জ্ঞানব্রত বসলেন অতি সন্তর্পণে। সারা ঘর জুড়ে রয়েছে বিশ্রী গন্ধ, অনেকটা পচা চামড়ার গন্ধের মতন। এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে জ্ঞানব্রত পায়ের

ডগাটি নাড়তে লাগলেন।

সিগারেটের তৃষ্ণাটা এই সময় তীব্র হয়ে ফিরে এলো। একা কোথাও বসে কারুর জন্য অপেক্ষা করায় সিগারেটের অভাবটা বেশী অনুভব করা যায়।

দু'মিনিট না হোক, প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো শশীকান্ত। হুড়ুস-ধাড়ুস করে গায়ে জল ঢেলেই সে ছুটে এসেছে। ভিজে চুল ঝুলছে মুখের চার পাশে।

—আপনি চা খাবেন, স্যার?

জ্ঞানব্রত প্রথমে বললেন, না, তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি আগে চুল আঁচড়ে নিন।

জ্ঞানব্রত ঠিক হুকুম করতে না চাইলেও তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তাঁর গলায় সেইরকম একটা সুর ফুটে ওঠে। প্রত্যেক দিন অনেক-গুলি মানুষ তাঁর আদেশ মেনে কাজ করে। সেই জন্যই জ্ঞানব্রতর এইভাবে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে।

শশীকান্ত একটা খাটের তলায় উঁকি দিয়ে টেনে আনলো একটা কাঠের আয়না চিরুনী। তা দিয়ে ঝটাপট চুল আঁচড়ে ফেললো।

শশীকান্ত একটা সবুজ লুঙ্গির ওপর পরেছে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। এ রকম রঙের অসামঞ্জস্যে জ্ঞানব্রতর চক্ষুকে পীড়া দেয়। তবু তিনি মুখে পাতলা হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন।

—আপনি রেডিওতে গান করেন?

—হ্যাঁ স্যার। আপনি কি রেকর্ড কোম্পানি থেকে এসেছেন?

—না। আমার সঙ্গে ওসবের কোন সম্পর্ক নেই। একদিন রেডিওতে আপনার একটা গান শুনে…ই'য়ে আমার…।

জ্ঞানব্রত ঠিক শব্দটি খুঁজে পেলেন না। বস্তুত দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। বাংলা কথার মধ্যেও মিশে যায়—ইংরেজি পরপর দু'তিনটে টানা বাংলা বাক্য বলার অভ্যেস তাঁর নেই।

—তিনি সংক্ষেপে বললেন, ভালো লেগেছিল।

—কোন গানটা স্যার!

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে⋯করিয়ে পাগলপারা⋯।

—ও, ওখানা বড় ভালো গান স্যার! সকলেরই ভালো লাগে।

—লালন ফকিরের, তাই না?

—ঠিক ধরেছেন স্যার! তবে লালন ফকিরের গানে কপি রাইট নাই। রেডিও'র লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল⋯

জ্ঞানব্রত একটা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বার করে খুললেন। সেটির মধ্যে রয়েছে একটি নতুন হাতঘড়ি।

বাক্সটি শশীকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে জ্ঞানব্রত অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনার গান শুনে আমার ভালো লেগেছিল সেইজন্য সামান্য একটি উপহার এনেছি। আপনি নিলে আমি খুব খুশী হবো।

শশীকান্ত নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন! রেডিওতে একখানা গান শুনে কেউ এসব দামি জিনিস উপহার দিতে পারে? রেডিওতে তো সবাই বিনা পয়সায় গান শোনে। পুরো একদিনের প্রোগ্রামের জন্য রেডিও থেকে সে পায় পঞ্চাশ টাকা মাত্র। আর এই ভদ্রলোক একখানা গান শুনে দিচ্ছেন একটা ঘড়ি। এর দাম পাঁচশো না হাজার কে জানে।

—এটা সত্যিই আমায় দিচ্ছেন স্যার!

—আপনার জন্যই এটা এনেছি।

বস্তুত এটাও জ্ঞানব্রতর সাহেবী ব্যবহারেরই একটা অঙ্গ। এদেশের লোক অন্য লোকের সময়ের দাম দিতে জানে না। যখন তখন অন্যের বাড়ীতে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট করতে কারুর বাধে না। কিন্তু নিজের গরজে কারুর কাজে গেলে তার বিনিময়ে কিছু দেওয়া উচিত। জ্ঞানব্রত তো নিজের গরজেই এসেছেন।

শশীকান্ত মুগ্ধভাবে ঘড়িটি দেখছে। সেদিক থেকে তার চোখ ফেরাতে পারছে না। বোঝাই যায় সে কখনো নিজস্ব হাতঘড়ি হাতে পরার সুযোগ পায় নি।

—আমার একটা উপকার করবেন ?

চমকে উঠে শশীকান্ত বললো, কী বলুন, স্যার ?

—সেদিন রেডিওতে আপনার ঐ গানটা আমার পুরোপুরি শোনা হয় নি। যতটা শুনেছিলাম তাও মনে নেই। ঐ গানটি আমাকে আর একবার গেয়ে শোনাবেন ?

—এখন শুনবেন, স্যার ; এখানে মিউজিক টিউজিক কিছু নেই, রেডিও ষ্টেশানে ওদের সব ব্যবস্থা থাকে। আচ্ছা। আমি খালি গলাতেই শোনাতে পারি অবশ্য—

হঠাৎ জ্ঞানব্রতর মনে হলো, মেসের এই গুমোট-অন্ধকার ঘরে বসে ঐ গানটা শুনলে তাঁর ভালো লাগবে না। বরং আরো ভালো লাগাটা কেটে যাবে।

তিনি হাত তুলে বললেন, থাক। এখন থাক। এক কাজ করলে হয় বরং…একদিন আমার বাড়ীতে গিয়ে ঐ গানটা গাইবেন। তাহলে টেপে তুলে রাখতে পারি। যাবেন আমার বাড়ীতে ?

শশীকান্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়ে বললো, নিশ্চয়ই যাবো, স্যার। কোথায় আপনার বাড়ি ? কবে যাবো ?

কোটের পকেট থেকে জ্ঞানব্রত নিজের একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, এতে সব লেখা আছে।

যদি শশীকান্ত ইংরেজি না পড়তে পারে, সেইজন্য তিনি মুখেও নির্দেশ দিয়ে দিলেন তার বাড়ির অবস্থান সম্পর্কে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কাল থেকে এই রবিবারের মধ্যে যে কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা আসতে পারেন। সাতটার পর থেকে আমি বাড়িতে থাকবো।

—কালই যাবো, স্যার।

—আপনি এ গান কার কাছ থেকে শিখেছেন ?

—কুষ্টিয়ায় যখন ছিলাম, তখন বাবন্ সাঁইয়ের কাছ থেকে শিখেছিলাম। বাবন্ সাঁই অনেক গান শিখিয়েছেন আমায়। তিনি খোদ লালন ফকিরের শিষ্যের শিষ্য।

—কুষ্টিয়া?

—হ্যাঁ স্যার। সেখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে এসেছেন কবে?

—এসেছি তো স্যার দুই বৎসর আগে···তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছি। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। এখানে এই ঘরে পরেশ রায় থাকেন। তিনি আমাদের গ্রামের লোক, তিনি দয়া করে কিছুদিনের জন্য আমায় থাকতে দিয়েছেন। তা অন্য যে একজন আছেন তিনি পছন্দ করেন না আমায়। তিনি এক ঘরে তিনজন থাকা নিয়ে ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করেছেন।

—আপনার বাড়ির অন্য লোকজন কোথায়?

—আমার মা বাবা কেউ নেই, স্যার। আর দুচার মাস পরে আমি নিজেই একখানা ঘর ভাড়া করতে পারবো মনে হয়। রেডিও আর্টিষ্ট হবার পর দু'চার জায়গায় ফাংশানে চান্স পাই, স্যার। প'চাত্তর টাকা করে দেয়।

—কুষ্টিয়ার কোন্ গ্রামে ছিল আপনার বাড়ি?

—কুমারখালী। আপনি কুমারখালী গ্রামের নাম শুনেছেন, স্যার? কুমারখালীতে থানাও আছে—।

যেন একটা বিদ্যুৎ চমকালো জ্ঞানব্রতর মাথার মধ্যে। তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর দাদামশাইয়ের মুখখানা। লম্বা চেহারা, সারা মুখে দাড়ি। সম্রাট শাহজাহানের মতন পেছনে দুটি হাত দিয়ে পায়চারি করতেন লম্বা টানা বারান্দায় আর মুখে প্রায় সব সময়ই থাকতো গুনগুন গান। গান বাজনার দারুণ ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই দাদামশাইয়ের মুখেই জ্ঞানব্রত এই গানটা শুনেছেন অতি শৈশবে। ক'দিন ধরে সেই কথাটাই মনে করতে পারছিলেন না।

হ্যাঁ, একথাও মনে পড়ছে যে দাদা মশাইয়ের কাছে প্রায়ই একজন

ফকির এসে গান শোনাতেন। দু'জনে বন্ধুত্ব ছিল খুব। সেই ফকিরই কি বাবন সাঁই।

জ্ঞানব্রত অনেকটা আপন মনেই বললেন, কী আশ্চর্য যোগাযোগ? ঐ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আমিও থাকতাম!

—আপনার বাড়ি কুমারখালীতে, স্যার? কোন্ বাড়ি?

—আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি, সেখানেই আমি বেশী থেকেছি। আমার দাদামশাই ছিলেন সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি। খুব নামকরা বাড়ি—।

জ্ঞানব্রত সেখানে ছিলেন মাত্র ন' বছর বয়েস পর্যন্ত। সেই সময় দাদামশাই মারা যান। তারপর এগারো বছর বয়েসে পিতৃবিয়োগ। তারপর থেকে অনেকগুলি দুঃখ কষ্টের বছরের কথা স্পষ্ট মনে আছে জ্ঞানব্রতর, কিন্তু তার আগের কথা কিছুই মনে পড়ে না। অথচ সেই সময়টা ছিল কত সুখের।

অনেকের তো দু'তিন বছর বয়েসের কথাও কিছু কিছু মনে থাকে। অথচ জ্ঞানব্রতর শৈশবটা নিশ্চিহ্ন। শুধু একটা গান, সেই সময় শোনা একটা গান, এতদিন পরে ফিরে এলো।

জ্ঞানব্রত সেই ধরনের মানুষ নন যে তিনি এক সময় কুষ্টিয়ায় ছিলেন বলেই আর একজন কুষ্টিয়ার লোককে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরবেন আনন্দে। ওরকম দেশোয়ালী প্রীতি তাঁর নেই। বস্তুত পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তীব্র কোনো নস্টালজিয়াও তিনি বোধ করেন না। মানুষ বাঁচে বর্তমান দিয়ে, হঠাৎ জ্ঞানব্রত শশীকান্তকে বললেন, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

শশীকান্ত আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

—আপনার বাক্স-বিছানা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে। আপনার থাকবার জায়গার অসুবিধে বলছিলেন, আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন।

—আপনার বাড়িতে থাকবো, স্যার?

—হ্যাঁ।

—আজই ?

—তাতে অসুবিধে কি আছে ?

—পরেশদাকে কিছু বলে যাবো না ?

—ওকে চিঠি দিয়ে যান। পরে আর একদিন এসে সব বুঝিয়ে বলবেন। আমার বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। আপনার অসুবিধে হবে না।

—না, না, আমার আর কী অসুবিধে. আমি যেখানে সেখানে থাকতে পারি···কিন্তু, সত্যি বলব স্যার ? কেমন কেমন সব লাগছে। মনে হচ্ছে যেন রূপকথা। আপনি এসে আমায় একটা ঘড়ি দিলেন তারপর বললেন, আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন এও কি সম্ভব।

জ্ঞানব্রত এবার বেশ জোরে জোরে হাসলেন!

তারপর বললেন, আপনাদের এই গলির মোড়ে আমার গাড়ি আছে। আমি সেখানে অপেক্ষা করছি! আপনি তৈরী হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।

শশীকান্তকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত।

নিজের বাড়িতে এসে শশীকান্তকে নিয়ে সরাসরি উঠে এলেন দোতলায়।

এখানে একটি গেষ্ট রুম সারা বছর সাজানোই থাকে। অতি নিকট আত্মীয় কেউ এলেই তবে তাঁকে রাখা হয় এই দোতলার ঘরে। এ ছাড়া একতলায় আরও দুটি ঘর আছে।

শশীকান্তকে ঘর এবং সংলগ্ন বাথরুম দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞানব্রত, এই সময় সুজাতা এসে সেখানে দাঁড়ালো। যতই অবাক হোক মুখে তার কোনো চিহ্ন ফোটাবে না সুজাতা, তবু মনে মনে সে ভাবছে, হঠাৎ কী হলো মানুষটার ? গত কয়েকদিন ধরে যে-রকম ব্যবহার করছে তা কিছুতেই তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। এই রকম একটা কাঠের মিস্ত্রী টাইপের লোককে ধরে এনে দোতলার

ঘরে রাখতে চায়।

জ্ঞানব্রত স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, সুজাতা, ইনি একজন শিল্পী, এর নাম শশীকান্ত দাস, আজ থেকে ইনি আমাদের এখানে থাকবেন। দেখো, যেন এর কোনো অযত্ন না হয়।

শশীকান্ত এগিয়ে এসে সুজাতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সুজাতা 'আরে' 'আরে' বলে দু'তিন পা পিছিয়ে গেল।

জ্ঞানব্রত বললেন, উজ্জয়িনী কোথায়? ওর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিতে চাই।

পরদিনই জ্ঞানব্রত চলে গেলেন মাদ্রাজে।

বাড়িতে যে কী একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে গেলেন, তা জ্ঞানব্রত খেয়ালও করলেন না। কয়েকটা দিন তিনি একটু পাগলামিতে মেতে ছিলেন; কিন্তু কোম্পানীর নানান কাজ তাঁকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাকছে।

মাদ্রাজ থেকে দিল্লী, সেখান থেকে উলটে আবার বাঙ্গালোর, তারপর বোম্বাই। অর্থাৎ সাতদিনে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল ওড়া-উড়ি করতে হলো জ্ঞানব্রতকে।

এদিকে বাড়িতে এক অদ্ভুত অতিথি।

প্রথম গোলমাল শুরু হলো সকাল আটটায়।

সুজাতা কোনদিনই ন'টার আগে জাগে না। এখন স্বামী কলকাতায় নেই, এখন তো আরও বেলা পর্যন্ত ঘুমানো যায়। কাল রাতে সুজাতা স্লিপিং পিল খেয়ে শুয়েছে। তবু আটটার সময়েই তার ঘরের দরজায় দুম দুম ধাক্কা।

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘুম-জড়িত চোখে দরজা খুলে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার!

সুজাতার শিক্ষা-দীক্ষা এমনই যে, সে কোনো কারণে বিরক্ত হলেও প্রথমেই ঝি-চাকরের ওপর ধমকে ওঠে না, কিংবা বাড়িতে ডাকাত-পড়া অথবা আগুন লাগার মতন বিচলিত হয়ে ওঠে না যখন তখন।

সারদা এ বাড়ির বাসনপত্র মাজে, ঘর ঝাড় দেয়। সে প্রায় চোখ কপালে তুলে বললো, ও দিদিমণি। ও ঘরের বিছানায় কে একটা ডাকাতের মতন লোক ঘুমিয়ে আছে! কী সাংঘাতিক কথা! শিগগির পুলিশে খবর দাও!

মাথায় ঘুমের নেশা, সুজাতার আগের রাত্রির কথা স্পষ্ট মনে পড়লো না। সারদা আঙুল তুলে গেস্ট রুমটা দেখাল। সেখানে একজন লোক ঘুমিয়ে আছে! কে!

—বাবু কোথায়?

—বাবু তো ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তখন সুজাতার মনে পড়লো, জ্ঞানব্রতর আজ সকাল ছ'টা দশের ফ্লাইট ধরার কথা। নিশ্চয়ই পাঁচটার মধ্যে গেছে। এসব দিনে জ্ঞানব্রত কখনো স্ত্রীকে ডাকেন না।

কিন্তু গেস্ট রুমে কে শুয়ে থাকবে?

—রতন কোথায়?

—রতন দুধ আনতে গেছে, এখনো আসে নি।

এ বাড়ির কাজের লোকরা রাত্তিরে সবাই নিচে থাকে। সিঁড়ির মাঝখানে একটা লোহার গেট থাকে। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় রাত্রে। রোজ ভোরে জ্ঞানব্রত সেই গেট খুলে দেন। তিনি কলকাতার বাইরে থাকলে এই সারদা এসে রাত্রে শুয়ে থাকে দোতলার বারান্দায়।

পাতলা নাইটি পরে থাকে সুজাতা। ঘরের মধ্যে ফিরে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার বাইরে বেরুলেন। তারপর গেস্ট রুমের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন। এবার সব মনে পড়ে গেছে। সেই রাধাকান্ত না শশীকান্ত কী যেন, সেই লোকটি নিশ্চয়ই। জ্ঞানব্রত যাকে কাল রাত্রে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

সুজাতা হেসে জিজ্ঞেস করলো, কালো মতন একটা লম্বা লোক তো? সারদা বললো, হাঁ গো দিদিমণি! দেখলে ভয় করে!

—ভয়ের কিছু নেই। বাবুর চেনা লোক। জেগে উঠলে চা দিস।

সুজাতা আবার ফিরে গেল নিজের বিছানায়।

যাদের জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে না, তারা প্রায়ই কোনো রোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে ভাবতে ভালোবাসে।

সারদা ধরেই নিয়েছিল যে, কোনো হুমদো চেহারার চোর এ বাড়িতে ঢুকে পড়ে, তারপর মনের ভুলে ঘুমিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে ওকে আটকে সবাই মিলে চেঁচিয়ে, পুলিশ ডেকে বেশ একখানা জমাট ব্যাপার হবে। সে সব কিছুই হলো না। এ রকম উটকো চেহারার লোক বাবুর চেনা! বাবুদের বিছানায় শোবে? সারদার স্বামীও তো এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল, সে কোনদিন বাবুদের গদীতে শোওয়ার কথা কল্পনাও করে নি।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সারদা এবার নির্ভয়ে অতিথি ঘরে ঢুকল। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, মুখে মেচেতার দাগ, তবু সারদাকে দেখলে কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের গিন্নী হিসেবে অনেকের মনে হতে পারে। বেশ পরিষ্কার একটি সাদা শাড়ী পরা। এ বাড়ির দাস-দাসীরা ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকবে, এই সুজাতার নির্দেশ। ওদের জামা-কাপড় কিনে দিতে সুজাতার কোনো কার্পণ্য নেই।

শশীকান্ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে তার একটা পা। তার শোয়ার ভঙ্গিতেও গ্রাম্যতা আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারে নি। ঘুমোনো সহজ না কি? তার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। নরম বিছানায় শুয়ে শুয়েও উত্তেজনায় তার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কী হয়ে গেল ব্যাপারটা! এসব স্বপ্ন নয় তো? মাঝে মাঝে উঠে উঠে সে হাত ঘড়িটা দেখছিল। এই ঘড়িটাও সত্যি, তার নিজস্ব ঘড়ি। ঠিক যেন সোনা দিয়ে তৈরি।

শেষ রাতে সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারদা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী জোরে ঘর ঝাঁট দিতে লাগলো। তাতেও লোকটার ঘুম ভাঙ্গলো না দেখে সে জিনিসপত্র সরাতে লাগলো খটাখট শব্দে। এক সময় শশীকান্ত চোখ মেলে তাকাতেই সারদা ঘুরিয়ে নিল নিজের মুখটা। একটাও কথা বললো না সে লোকটার সঙ্গে। শুধু, সে যে লোকটিকে পছন্দ করে নি, এটাই বুঝিয়ে দিতে চায়।

শশীকান্তও সারদার সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল না।

সুজাতার ভাঙ্গা ঘুম আর জোড়া লাগে নি। আরও কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করার পর ডাকলেন, রতন! রতন!

রতন ততক্ষণে দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। চায়ের জলও চাপানো আছে। রতন! সুজাতা ডাকা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে আসতে হয়। খুব পাতলা চা দু'তিন কাপ খায় সুজাতা।

রতন চায়ের ট্রে এনে সাজিয়ে দিল সুজাতার বেড-সাইড টেবিলে।

—ঐ যিনি গেষ্ট রুমে আছেন, তাঁকে চা দিয়েছিস্?

—না।

—উনি জেগেছেন?

—হ্যাঁ।

—তা হলে চা দিস নি কেন?

—ও চা খায় কিনা তাতো আমি জানিনা।

সুজাতা হাসলো। রতনের মুখখানা গোঁজ হয়ে আছে। রতনের মনের ভাব বুঝতে সুজাতার একটুও অসুবিধে হয় না।

রতনের চেহারা ও পোশাক ঐ লোকটির থেকে অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। ঐ রকম একটি লোককে ডেকে এনে বাবুদের বিছানায় শোওয়ানো হবে, এটা সে পছন্দ করবে কেন? এ রকম লোককে সেবা করতেও সে অরাজী।

—ওকে জিজ্ঞেস কর। উনি যদি চা না খান, তা হলে এক কাপ

দুধ দে। উনি খুব ভালো গান করেন।

—আজ দুপুরেও এখানে খাবে?

—খাবেন তো নিশ্চয়ই। উনি এখানে বেশ কয়েকদিন থাকবেন। তোদের বাবু তাই তো বলে গেছেন।

এবার সুজাতা স্নানের ঘরে ঢুকবে। এরপর অন্তত এক ঘণ্টার জন্য সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

শশীকান্ত ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছে উবু হয়ে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘর থেকে বেরুতে সে ভয় পাচ্ছে। জ্ঞানব্রত বাবু তাকে এ ঘরে থাকতে বলেছেন। এ ঘরের বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করা কি উচিত তার পক্ষে?

রতন কিছু জিজ্ঞেস না করেই এক কাপ চা রেখে গেছে তার সামনে। গরম গরম চা-টা শেষ করে ফেললো শশীকান্ত। এর আগে একবার সে বাথরুমটা দেখে এসেছে। বাথরুমে কমোড। শশীকান্ত জানে না ও জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। ওঃ, কি ঝমেলার মধ্যে তাকে ফেললেন ঐ জ্ঞানব্রত বাবু।

এর পরের বিপত্তিটা হলো অন্য রকম।

উজ্জয়িনী কাল নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। ফিরেছে প্রায় রাত বারোটায়। সুতরাং সে শশীকান্তকে দেখে নি।

দশটা আন্দাজ ঘুম থেকে উঠেই উজ্জয়িনী গেল বাথরুমে। টুথব্রাশ হাতে নিয়ে দেখলো, টুথ পেস্ট নেই।

টুথ পেস্ট কোম্পানীর মালিকের বাড়িতেও কখনো টুথ পেস্ট না থাকা বিচিত্র কিছু নয়। যে জিনিস ইচ্ছে করলেই বিনে পয়সায় শত শত পাওয়া যায়, সেই জিনিসের কথা মনেই থাকে না।

এমনও হয়েছে, সকালবেলা বাথ-রুমে টুথ পেস্ট না পেয়ে রতনকে পাঠিয়ে দোকান থেকে টুথ পেস্টের নতুন টিউব কিনে আনতে হয়েছে। রতন অতশত বোঝে না। সে এনেছে অন্য কোম্পানীর টুথ পেস্ট। তখন সেটা ফেরত পাঠানো হলো। কিন্তু

পাড়ার দোকানে গোল্ডেন স্টার টুথ পেস্ট নেই। ফলে বাধ্য হয়েই অন্য টুথ পেস্ট ব্যবহার করতে হতো।

জ্ঞানব্রত দৈবাৎ নিজের বাড়ীতে সেই অন্য কোম্পানীর টুথ পেস্টের টিউব দেখে ফেলেছিলেন। তিনি ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন নি।

বাথরুমের বন্ধ দরজার আড়াল থেকে দু'বার চেঁচিয়ে ডাকল, মা, মা।

কিন্তু সুজাতা নিজেই এখন বাথরুমে বন্দী। সে এখন মেয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না।

উজ্জয়িনীর স্বভাব অত্যন্ত ছটফটে। কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই। সব জিনিস তার এক্ষুণি, এক্ষুণি চাই।

তার মনে পড়লো। গেস্ট রুমের সঙ্গের বাথরুমে এক সেট জিনিস সব সময় রাখা থাকে। ওখান থেকে টুথ পেস্ট ধার করা যায়।

হাতে ব্রাশটা নিয়ে রাত-পোশাক পরা অবস্থাতেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে উজ্জয়িনী ছুটে গেল গেস্ট রুমে।

মায়ের কাছ থেকে এইটুকু অন্ততঃ শিক্ষা পেয়েছে উজ্জয়িনী যে সে হঠাৎ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে না, সহজে ভয়ও পায় না।

বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ লুঙ্গি পরা, খালি গায়ের একজন কালো, লম্বা লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আড়ষ্টভাবে থমকে গেল উজ্জয়িনী।

বাঘকে বশ করবার জন্য যেমন তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকতে হয়; সেই রকমভাবে চেয়ে উজ্জয়িনী জিজ্ঞেস করলো, তুমি—তুমি কে?

তার চেয়েও বেশী আড়ষ্টভাবে শশীকান্ত বললো, আজ্ঞে, আমার নাম শশীকান্ত দাস—

—তুমি এখানে কী করছো?

—আজ্ঞে, জ্ঞানব্রতবাবু আমাকে এখানে থাকতে বলেছেন।

—এখানে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি নিজে কাল রাতে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন···আমি নিজে থেকে আসতে চাই নি, তিনিই জোর করে বললেন।

উজ্জয়িনী শশীকান্তর আপাদমস্তক আর একবার দেখলো। কিছুতেই এর কথা বিশ্বাস করা যায় না। তার বাবা এই রকম একটা লোককে···রতন রতন বলে ডাকতে ডাকতে উজ্জয়িনী বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। তারপর রতনের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

সারাদিন ধরে শশীকান্তর সঙ্গে কথা বলার জন্য কেউ এলোনা।

উজ্জয়িনী চলে গেল কলেজে। একটু পরে সুজাতাও চলে গেল মহিলা সমিতির এক মিটিং-এ। সুজাতার খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। এক একদিন দুপুরে কিছু খাওয়াই হয় না। শরীর থেকে অন্তত দশ পাউন্ড ওজন খসিয়ে ফেলতে সে বদ্ধপরিকর।

রতন দুপুরের খাবার দিয়ে গেল শশীকান্তর ঘরেই।

চীনে মাটির প্লেটে ভাত, তারই মধ্যে ডাল, আলু ভাজা। আর একটি বাটিতে মাংস।

ঐ টুকুনি ভাত, শশীকান্ত তিন গেরাসে খেয়ে নিতে পারে। বস্তুতঃ ভাত ছাড়া তার আর কোনো প্রিয় খাদ্য নেই। শুধু একটু ডাল পেলেই সে পুরো এক সের চালের ভাত খেয়ে ফেলতে পারে।

সেই ভাতটুকু শেষ করে শশীকান্ত থালা চাটতে লাগলো। রতনের আর পাত্তা নেই।

মেস বাড়ির ঠাকুরও জিজ্ঞেস করে আর ভাত লাগবে ? আর এ বাড়ির কেউ তা জিজ্ঞেস করলো না ? এ কী রকম বাড়ি ! গতকাল রাতে জ্ঞানব্রত নিজের সঙ্গেই শশীকান্তকে নিয়ে বসে ছিলেন খাবার টেবিলে। রাতে ছিল রুটি। শশীকান্ত রুটি পছন্দ করে না। তাছাড়া প্রথম দিন সে লজ্জায় বেশী খায় নি। কিন্তু প্রত্যেক

দিন এরকম সিকি-পেটা খেয়ে থাকতে হলেই হয়েছে আর কি। তা হলে কাজ নেই তার নরম গদীর বিছানায়।

সারাদিন শশীকান্ত চুপচাপ শুয়ে রইলো সেই ঘরে।

রাতে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে ফেললো সে।

রতন খাবার নিয়ে আসতেই সে বলে উঠলো, আমি রুটি খাই না। ভাত নেই ?

রতন বললো, এ বাড়িতে রাত্রিতে ভাত হয় না।

শশীকান্ত তাতেও দমে না গিয়ে বললো, বেশ। কিন্তু ও কয়খানি রুটিতে আমার পেট ভরবে না। আরও রুটি লাগবে।

খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখে রতন ফিরে গেল। ফিরে এলো আরও প্রায় দশ বারোখানা রুটি নিয়ে।

ব্যাঙ্গের সুরে সে জিজ্ঞেস করলো, এতে হবে ?

শশীকান্ত ঘাড় নাড়লো।

তারপর মুখ তুলে, খাতির করা গলায় জিজ্ঞেস করলো—দাদার নাম কী ?

খুবই অবজ্ঞার সুরে সে বললো, রতনকুমার দাস।

উৎসাহিত হয়ে শশীকান্ত বললো, আপনিও দাস। আমিও দাস। আমার নাম শশীকান্ত দাস। কুষ্টিয়ায় বাড়ি।

এতেও বরফ গললো না। আর কোনো উত্তর না দিয়ে রতন চলে গেল। যেন সে বুঝিয়ে দিতে চায়, তার দাস আর শশীকান্তর দাস এক নয়। বাংলাদেশের লোক। তাই ধরণ ধারণ এরকম।

প্রায় এই রকম ভাবেই সাতটা দিন কাটলো।

নির্জনতায় অতিষ্ঠ হয়ে সপ্তম রাত্রিতে মরীয়া হয়ে গিয়ে শশীকান্ত ধরলো গান। বেশ উঁচু গলায়। সেই গানটা, 'শহরে ষোলোজন বোম্বেটে—

তখন উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে ইংরেজি বাজনা।

অষ্টম দিন দুপুরে দমদম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছুলেন জ্ঞানব্রত।

আগে থেকে খবর দেওয়া আছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ ছাড়া মালপত্রের ঝঞ্ঝাট নেই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত বেরিয়ে আসছেন বাইরে, হঠাৎ একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে কোথা থেকে তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালো।

এক গাল হেসে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছেন ?

মুখে একটানা ভ্রমণের ক্লান্তি, হাতে একটা ভারি ব্রীফকেস, জ্ঞানব্রত চাইছিলেন কোনোক্রমে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে গলার টাই ও জামার বোতাম খুলে ফেলতে।

সামনে মেয়েটিকে দেখে তাকে থমকে দাঁড়াতেই হলো।

মেয়েটি সারা মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে বললো, নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছেন ? আমি কে বলুন তো ?

এই কয়েকটা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষজনের মধ্যে থাকতে হয়েছে। জ্ঞানব্রত বাংলাতে কথা বলারও কোনো সুযোগ পান নি। হঠাৎ কলকাতায় পা দেবার পর-মুহূর্তেই কেউ এরকম পরীক্ষায় ফেললে তিনি পারবেন কেন ?

মেয়েটিকে চেনা লাগছে ঠিকই।

জ্ঞানব্রত দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। মেয়েটি বেশ রূপসী, সঙ্গে কেউ নেই,এয়ারপোর্টে একা, তবে কি কোনো এয়ার হোস্টেস ? কিন্তু এয়ার হোস্টেসদের পোশাকের মধ্যে কীরকম যেন নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার থাকে, সেটা দেখলে বোঝা যায়। এর পোশাক সে রকম নয়। বেশ একটা চড়া রঙের লাল শাড়ী পরে আছে।

মেয়েটি জ্ঞাতব্রতর চোখে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করছে বলে তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনতে পারবো না কেন ?

—আমার নাম বলুন তো ?

নামটা তো মনে নেই বটেই, এমনকি কোথায় যে দেখেছেন মেয়েটিকে, তাও মনে করতে পারছেন না জ্ঞানব্রত।

—এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ? এই তো মাত্র দশ বারো দিন

আগে দেখা হয়েছিল।

—কোথায় ?

—ক্যালকাটা ক্লাবে। আপনার এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন, কতক্ষণ আপনার টেবিলে বসলাম।

—এলা ?

—যাক, চিনতে পেরেছেন তাহলে।

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, কেন মেয়েটিকে তিনি ঠিক প্লেস করতে পারছিলেন না। এ রকম একটি সুশ্রী মেয়েকে মাত্র কয়েক-দিন আগেই দেখে তাঁর ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেদিন মেয়েটি জিন খেয়ে নেশা করেছিল বলে তার চোখ দুটি ছিল কাঁচের মতন। আজ প্রায় সর্বক্ষণই দেখেছিলেন বসে থাকা অবস্থায়। আজ একে দেখছেন একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। বিভিন্ন রকম চুল বাঁধবার কায়দাতেও মেয়েদের মুখ অনেকখানি বদলে যায়।

—জানেন, আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক ?

বিমান যাত্রীদের কাছে এ সংবাদ বেশ একটা বড় সমস্যা বটে, কিন্তু জ্ঞানব্রতের মনে কোনো দাগ কাটলো না। কলকাতা শহরে তাঁর ট্যাক্সি চড়ার কোনো অবকাশ হয় না। তাঁর জন্য নিশ্চয়ই গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে।

—তুমি কোথাও যাচ্ছো, না আসছো ?

এলা আবার হেসে ফেললো। তারপর ছেলেমানুষদের মতন দুষ্টুমীর সুরে বললো, আমি কোথাও যাচ্ছিও না, আসছিও না।

জ্ঞানব্রত ব্রীফকেসটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলেন।

—আমি একজনকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।

—ও।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো হলো। চলুন একটু কফি খাবেন ? সেদিন আপনি আমাকে অনেক খাইয়ে দিলেন আজ আমি আপনাকে খাওয়াবো।

একটু ইতস্ততঃ করে জ্ঞানব্রত বললেন, ঠিক কফি খাবার ইচ্ছে

এখন আমার নেই, বাড়ি ফেরার একটু তাড়া আছে, ওটা না হয় আর একদিন হবে।

—আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই? আমি কিন্তু লিফ্‌ট নেবো।

—খুব ভালো কথা।

—আসবার সময় কী কাণ্ড! আমার এক দিদি আজ আগরতলায় গেল। সঙ্গে অনেক মালপত্র, এদিকে ট্যাক্সি বন্ধ···শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে একটা শেয়ারের গাড়িতে···

টার্মিনালের বাইরে এসে জ্ঞানব্রত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এক জায়গায়। গাড়ি তাঁকে খুঁজতে হবে না। গাড়ির ড্রাইভারই তাঁকে খুঁজে বার করবে।

—কোথায় আপনার গাড়ি? কত নম্বর?

—ব্যস্ত হবার কিছু নেই, গাড়ি আসবে এখানে।

—জানেন, আপনি আমার একটা দারুণ উপকার করেছেন?

জ্ঞানব্রত রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন, আমি! আমি আপনার কী উপকার করেছি? মাত্র একদিন দেখা।

—চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে বলছি।

ঠিক এই সময় একজন কেউ ডাকলেন, জ্ঞানদা! জ্ঞানদা!

জ্ঞানব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখলেন বাবুল আমেদ হন্তদন্ত হয়ে আসছে এই দিকে। দু'হাতে দুটি সুটকেস।

বাবুল আমেদ মোটাসোটা, হাসি খুশি মানুষ। কার্ড বোর্ড বক্সের বেশ বড় ব্যবসা আছে। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। জ্ঞানব্রতর চেয়ে দু'তিন বছরের বড়ই হবেন, কিন্তু ইনি প্রায় সবাইকেই দাদা বলে ডাকেন।

—আরে দাদা, কী ঝামেলায় পড়েছি। আমার ফেরার কথা ছিল গতকাল। সে ফ্লাইট মিস করেছি, তারপর আর খবরও দিতে পারিনি, সেই জন্য আমার গাড়ি আসেনি। এদিকে আবার ট্যাকসি স্ট্রাইক। আপনার কী অবস্থা?

জ্ঞানব্রত বললেন, চলুন, আপনাকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

এলার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া পড়লো। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সে পছন্দ করছে না।

জ্ঞানব্রতর কোম্পানির গাড়ি তখনই চলে এলো সামনে। ড্রাইভার নেমে সেলাম করতেই জ্ঞানব্রত বললেন, পেছনের বুট খুলে দাও, এই সাহেবের সুটকেস যাবে।

এলা বললো, আমি সামনে বসি।

বাবুল আমেদ বললেন, না, না, আপনি সামনে বসবেন কেন? আমি বসবো। আমার সামনে বসাই অভ্যেস।

গাড়ি চলতে শুরু করার পরই বাবুল আমেদ ব্যবসাপত্রের কথা শুরু করে দিলেন। দাদা, আপনি স্টেট ট্রেডিং-এর মালহোত্রাকে চেনেন? এবার দিল্লীতে গিয়ে দেখলাম।...

জ্ঞানব্রত হুঁ হুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ কথা থামিয়ে বাবুল আমেদ বললেন, রোককে। ড্রাইভার সাহেব, এখানে একটু রুখে দিন তো।

—কী হলো?

—এই সামনের দোকান থেকে একটু কোল্ড ড্রিংকস নেবো। অনেকক্ষণ ধরে তেষ্টা পেয়েছে। হঠাৎ কী রকম গরমটা পড়ে গেল দেখলেন?

গাড়ী থামতে পাশের দোকানে চার বোতল কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিলেন বাবুল আমেদ, অর্থাৎ ড্রাইভারের জন্যও একটা। পেছনের সীটে দুটি বোতল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি জ্ঞানব্রতকে বললেন, দাদা এ আপনার মেয়ে তো? এতক্ষণ চিনতেই পারিনি, সেই অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলাম, ফ্রক পরার বয়েস তখন—

এরকম ভুল করার জন্য বাবুল আমেদকে দোষ দেওয়া যায় না।

এলা তো জ্ঞানব্রতর মেয়েরই প্রায় সমবয়েসী। তাছাড়া অনাত্মীয় যুবতী মেয়েকে নিয়ে গাড়ীতে ঘোরার সুনাম জ্ঞানব্রতর নেই ব্যবসায়ী মহলে।

এলা মুখটা ফিরিয়ে থাকে।

জ্ঞানব্রত একটু বিব্রতভাবে বললেন, না, না, আমার মেয়ে না। মেয়ের বান্ধবী, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা হলো।

জ্ঞানব্রতকে সামান্য মিথ্যে কথা বলতে হলো। এলা তাঁর মেয়ের সঙ্গে এক বছর এক কলেজে পড়েছে বটে, কিন্তু তাঁর মেয়ের বান্ধবী নয়। উজ্জয়িনী এলার নাম শুনে ভালো করে চিনতেই পারে নি। বয়েসের তুলনায় এলা অনেক বড় হয়ে গেছে।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করার পর বাবুল আমেদ আবার ফিরে গেলেন ব্যবসার কথাবার্তায়। এলা কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না।

বাবুল আমেদ নামলেন মৌলালীতে।

তারপর এলা গম্ভীরভাবে বললো, আমাকে এসপ্লানেডে ছেড়ে দিলেই হবে।

—তোমার বাড়ি কোথায় ?

—অনেক দূরে, বেহালার কাছে।

বেহালা অনেক দূরে তো বটেই তাছাড়া একেবারে অন্য রাস্তায়। জ্ঞানব্রত অতিশয় ভদ্র, মাঝপথে কোনো মহিলাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী পেঁাছে পোশাক বদলাবার জন্য তাঁর মনটা ছটফট করছে।

এখন রাত সাড়ে ন'টা। একবার তিনি ভাবলেন, তিনি আগে বাড়ী গিয়ে তারপর ড্রাইভারকে বলবেন, বেহালায় এই মেয়েটিকে পেঁাছে দিতে ? তাঁর বাড়ীর সামনে গাড়িতে এলা বসে থাকবে…।

জ্ঞানব্রতকে দ্বিধা করতে দেখে এলা বললো, আমাকে এই সামনে এসপ্লানেডে নামিয়ে দেবেন, আমার কোন অসুবিধে নেই। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে তো আমি মিনি বাসেই ফিরতাম।

জ্ঞানব্রত জোর দিয়ে বললেন, না সে প্রশ্নই ওঠে না। আমি তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আসবো। কতক্ষণ আর লাগবে।

—আমার বাড়ী পর্যন্ত গেলে আপনাকে একবার নামতে হবে।

কথা দিন।

—এখন, এত রাত্রে ?

—ক'টা আর বাজে ?

—অন্ততঃ দশটা বেজে যাবে।

—তাতে আর কী হয়েছে। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন শুধু।

—আমি সন্ধ্যের পর চা কফি কিছু খাই না।

এবার গলা নীচু করে, মুচকি হেসে এলা বললো, হুইস্কি অবশ্য খাওয়াতে পারবো না বাড়িতে।

জ্ঞানব্রত নিয়মিত মদ্যপান করেন না। কখনো কখনো একটু একটু। এ মেয়েটি কি তাঁকে নেশাখোর ভেবেছে নাকি ? পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে যাবার পর ক'জন লোকই বা রাত দশটার সময় চা খায় ?

এসপ্লানেড আসবার পর জ্ঞানব্রত ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন বেহালার দিকে যাওয়ার জন্য। তারপর তিনি অন্যমনস্কভাবে চুপ করে গেলেন।

—আপনি আমার ওপর রেগে গেলেন ?

—আরে ? রাগ করবো কেন ?

—কোনো কথা বলছেন না আমার সঙ্গে ?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এ মেয়েটা কি পাগল নাকি ? হঠাৎ তিনি রাগ করতে যাবেন কেন ওর ওপরে ? তা ছাড়া কোনো কিছু বলবার না থাকলেও কথা বলে যেতে হবে ? এমনিতেই কম কথা বলা তাঁর স্বভাব।

—আপনার কৌতূহল খুব কম, তাই না ?

—কেন ? সেটা কী করে বোঝা গেল ?

—আপনি আমায় এয়ারপোর্টে দেখেও প্রথমে জিজ্ঞেস করেন নি কার সঙ্গে সেখানে গেছি। তারপর এই যে আপনকে বললাম, একবার আমার বাড়িতে নামতে হবে, তখনও জিজ্ঞেস করলেন না, বাড়িতে কে কে আছে ?

জ্ঞানব্রত বুঝতে পারলেন, এবার মেয়েটি ঠিকই ধরেছে। এটা বোধ হয় সুজাতার প্রভাব। সুজাতা কখনো কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে না। নারী জাতির মধ্যে সুজাতার মতন এমন কম কৌতূহলপরায়ণা খুবই দুর্লভ।

তিনি হেসে বললেন, একটা ব্যাপারে অবশ্য আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে, তুমি তখন বললে, আমি তোমার উপকার করেছি সেটা কী উপকার?

—আপনি রেডিও'র স্টেশন ডিরেকটার পি. সি. বড়ুয়ার সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলেন, মনে আছে?

—হুঁ।

—উনি আমায় গানের প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন। আগে আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পাইনি। এবার যে পেলাম সে তো আপনার জন্যই।

—এ জন্য আমি তো কোনো চেষ্টা করি নি। যাই হোক। যদি তোমার উপকার হয়ে থাকে আর তাতে আমার কোনো যোগাযোগ থাকে, তাতে আমার খুশী হবারই কথা।

—সামনের মাসেই আমার প্রোগ্রাম।

—বাঃ!

—আপনারা বেশ মেকানিক্যাল। যখন তখন বাঃ বলতে পারেন। এলার গলায় রাগের ঝাঁঝের পরিচয় পেয়ে জ্ঞানব্রত একটু সচকিত হলেন। তিনি কোনো ভুল করে ফেলেছেন?

—এখানে, বাঃ! বলা বে-মানান?

—নিশ্চয়ই বে-মানান! আমি কেন গান করি, সে সম্পর্কে আপনার একটু কৌতূহল নেই, তবুও বললেন বাঃ।

রেডিওতে প্রত্যেকদিন কত ছেলে-মেয়েই তো গান গায়। তা ছাড়া জ্ঞানব্রত অতি কদাচিত রেডিও শোনেন। সুতরাং রেডিওতে কে কবে কী গান গাইবে, সে ব্যাপারে জ্ঞানব্রতর কৌতূহল বা আগ্রহ থাকবে কেন? কিন্তু যে জীবনে প্রথম

রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছে, তার কাছে এটা নিশ্চয়ই খুবই উত্তেজনার ব্যাপার।

—না। না। শুনতে হবে। একদিন শুনবো তোমার গান।

—দেখি, সে দিনটা কবে আসে।

—খুব শিগগিরই একদিন···

—একটা মুসকিল হয়েছে কী জানেন, আমি নজরুল-অতুল প্রসাদ গাই, কিন্তু বড়ুয়া সাহেব বললেন, পল্লীগীতিতে স্কোপ বেশী। ঐ প্রোগ্রামে ভালো আর্টিস্ট পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমার একটা করে পল্লীগীতির অনুষ্ঠানও করে যেতে হবে। আমি ফোক সং কোনোদিন তেমন শিখিনি···এখন শিখতে যেতে হবে কারুর কাছে।

এতক্ষণে শশীকান্তর কথা মনে পড়লো জ্ঞানব্রতর। তিনি একজন গায়ককে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। সে ছেলেটা কী করছে কে জানে? সে কি সুজাতা-উজ্জয়িনীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে?

—আমি একজন পল্লীগীতির গায়ককে চিনি। ভালো গায়। জানি না, সে তোমায় শেখাতে পারবে কি না।

—কে? কে? কি নাম?

—একদিন আলাপ করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে।

এলা তার ডান হাতটা সীটের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে জ্ঞানব্রতর একটা হাতের ওপর রাখলো। জ্ঞানব্রত প্রায় শিহরিত হলেন। এ কী করছে মেয়েটা? সামনে ড্রাইভার রয়েছে। এরকমভাবে তো প্রেমিক-প্রেমিকারা হাতের ওপর হাত রাখে। মেয়েটা তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে কেন?

জ্ঞানব্রত নিজের হাতটা সরিয়ে নিতেও পারলেন না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আড়ষ্টভাবে বসে রইলেন।

বেহালায় বাড়ির সামনে পৌঁছে এলা আর বিশেষ জোর করলো না। জ্ঞানব্রত দু'বার না বলতেই সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে।

আজ নামতে হবে না। কিন্তু বাড়ি তো চিনে গেলেন, অন্য কোন দিন আসবেন তো?

—হ্যাঁ, আসবো। গান শোনা আর চা পাওনা রইলো।

অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে জ্ঞাতব্রতর দিকে হেসে এলা খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি জানি, আপনি ঠিক আসবেন।

বাড়ি ফেরার পর সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, এত দেরি হলো? প্লেন লেট ছিল?

—না। আজ ট্যাক্সি স্ট্রাইক। দু'জনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

ভালো করে স্নান করে পা-জামা ও পাঞ্জাবী পরার পর জ্ঞানব্রত খুব স্বস্তির সঙ্গে বললেন, আঃ।

আজ তাঁর ভালো ঘুম হবে। নিজের বাড়িতে, নিজের বালিশটিতে মাথা দিয়ে ঘুমোনোর মতন আরাম আর নেই।

খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িটা বড্ড চুপচাপ লাগছে। খুকু কোথায়?

—ও নাইট শো-তে সিনেমায় গেছে। বুলু মাসীদের সঙ্গে। আর একটু বাদেই ফিরবে।

—তুমি গেলে না সিনেমায়?

—আমি কি সব সিনেমা দেখি? তাছাড়া তুমি আজ আসবে।

—সেই ছেলেটি কোথায়? সে খেয়েছে?

সুজাতা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে মুখখানা নিচু করে রইলো।

উত্তর না পেয়ে বিস্মিত হলেন জ্ঞানব্রত। চেয়ারে না বসে তিনি এগিয়ে গেলেন গেষ্ট রুমের দিকে।

সে ঘরটির দরজাটা বন্ধ। জ্ঞানব্রত একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঘর ফাঁকা।

এ কি? সেই ছেলেটি গেল কোথায়? শশীকান্ত? সুজাতা

খুব ধীর স্বরে বলল, সে আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে চলে গেছে। সারা দিনে আর ফেরে নি।

স্ত্রীকে দু'একটি প্রশ্ন করেই থেমে গেলেন জ্ঞানব্রত।

বাড়িতে তিনি একজন অতিথি রেখে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েক দিন কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখলেন সেই অতিথি নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় অতিথির প্রতি অযত্ন, অবহেলা, অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখান হয়েছিল নিশ্চয়।

কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ এমনকি উঁচু গলায় কথা বলাও জ্ঞানব্রতর স্বভাব নয়। তাঁর সব কিছুই মনে মনে।

শশীকান্ত কোথায় যেতে পারে? তার তো কোনো যাবার জায়গা নেই। যে মেস ছেড়ে চলে এসেছে, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেখানে একজন রুমমেট তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত ছিল। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? যোধপুর পার্কে বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত, অনেকেই বলে। পুলিশে ফোন করা কি উচিত হবে? শশীকান্ত একজন শক্ত-সমর্থ চেহারার পুরুষ মানুষ, সে বাড়ি ফেরেনি বলে থানায় খবর দিলে যদি সেখানকার লোকেরা হাসাহাসি করে।

পোশাক বদলে জ্ঞানব্রত দুটি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়লেন। সুজাতা বাথরুমে, উজ্জয়িনীর ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ারে একটা উগ্র বিদেশী সুর বাজছে। জ্ঞানব্রত একদিন দেখেছিলেন, উজ্জয়িনী ঘরের মধ্যে একা একাই নাচে। তখন বড় সুন্দর দেখায় ওকে, চোখ দুটো মোহের আবেশে বুজে আসা হাতের আঙুল-গুলো যেন গড়া। ঠোঁটের ভঙ্গিতে অদ্ভুত সারল্য। কিছু দিন ধরে মেয়ের কথা ভাবলেই এলার কথা মনে পড়ে। ওরা প্রায় একই বয়েসী। কিন্তু দু'জনে কত আলাদা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রাত-পোশাক পরা সুজাতা নিজের

খাটে শুয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কিন্তু আজ আর ডিটেকটিভ উপন্যাস খুললো না।

—তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো ?

জ্ঞানব্রত চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। চক্ষু বোজা। বুকের উপর আড়াআড়ি দুটি হাত রাখা। আজ আর ঘুমের আরাধনা করতে হবে না, ট্যাবলেট তার কাজ ঠিক সময় মতন করবেই। এর সঙ্গেই হাত-পা একটু ঝিমঝিম করছে।

—না। তুমি কিছু বলবে ?

—আমাদের যে এক সঙ্গে বাইরে কোথাও যাবার কথা বলেছিলে ? যাবে না ?

—হ্যাঁ। যাওয়া যেতে পারে। কোথায় যাবে, ঠিক করেছ ?

—পুরী।

—পুরী ! গত বছরই তো গিয়েছিলুম।

—গতবার তো সারাক্ষণই বৃষ্টি হলো···সমুদ্র আমার ভালো লাগে···

—ঠিক আছে। কালই হোটেল বুক করবার ব্যবস্থা করবো।

নিজের খাট থেকে উঠে এসে সুজাতা বললো, একটু সরো, তোমার পাশে আমি শোবো।

—আজ বই পড়বে না ?

—কেন, তোমার পাশে শুলে আপত্তি আছে ?

জ্ঞানব্রত হাত বাড়িয়ে সুজাতার কোমর ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। মনে মনে অনুশোচনা হলো। কেন ঘুমের ট্যাবলেট খেতে গেলেন আজ। আসল ব্যাপারটা হবার আগে সুজাতা অনেকক্ষণ আদর পছন্দ করে। যদি তার মধ্যে ঘুম এসে যায়।

জ্ঞানব্রতর মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে সুজাতা জিজ্ঞাসা করলো তুমি আমার উপরে রাগ করেছো ?

—কেন, রাগ করবো কেন ?

—ঐ যে গায়কটি, শশীকান্ত…ও বাড়ি ফেরেনি, তুমি ভাবছ ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি…

— না, না, সে কথা বলবো কেন ?

—লোকটি তো কথাই বলতে চায় না, এত লাজুক, আমি দু-এক বার চেষ্টা করেছি…তুমি শখ করে ওকে বাড়িতে ডেকে এনেছো, ওর যাতে কোনো অযত্ন না হয় সে কথা আমি কাজের লোকেদের বলেছিলাম।

—না, না, তুমি তো যথেষ্ট করবেই, আমি জানি।

—তোমার শরীর বেশ ভাল নেই, কিছুদিন ধরেই দেখছি, তুমি অন্যমনস্ক ?

—শরীর তো ঠিকই আছে। অন্যমনস্ক থাকি বুঝি ?

—তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করছো আজকাল।

সুজাতার উরু কি মসৃণ, তলপেটে ভাঁজ পড়েনি, বুক দুটি এখনো সুগোল। বোঝাই যায় না, তার অতবড় মেয়ে আছে। আজ জ্ঞানব্রতকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি এখনো সক্ষম পুরুষ মানুষ। কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না।

মধ্যপথে বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। বেড-রুমের টেলিফোনের কানেকশন রাত এগারোটার পর অফ করা থাকে। সুজাতা নিজেই এটা করে। আজ সে ভুলে গেছে। আজই। বেশী রাতের টেলিফোনের আওয়াজে কেমন একটা গা ছম ছম করা ভয় আছে। জ্ঞানব্রতর নির্দেশ আছে অফিসের হাজার জরুরী কাজ থাকলেও কেউ যেন তাঁকে রাত এগারোটার পর বিরক্ত না করে। কিন্তু যদি ফ্যাকটারিতে আগুন লাগে ?

স্বামী আর স্ত্রী দু'জনেই একটুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুনলো আওয়াজটা। তারপর সুজাতা বললো, আমি ধরবো ? জ্ঞানব্রত বললেন, না, আমি ধরছি।

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। জড়িত গলায় কে যেন

হিন্দীতে কী জানতে চাইছে।

জ্ঞানব্রত কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো? হু ইজ স্পিকিং? হুম ডু য়ু ওয়াণ্ট?

রং নাম্বার!

জ্ঞানব্রতর ইচ্ছে হলো টেলিফোন যন্ত্রটা আছড়ে ভেঙে ফেলতে। তার বদলে তিনি তার ধরে এক টান দিয়ে প্লাগটা খুলে ফেললেন। সুজাতা ততক্ষণে উঠে বসেছে। জ্ঞানব্রত ফিরে আসতেই বললো, আজ আর থাক।

জ্ঞানব্রত আপত্তি করলেন না। তিনি জানেন, একটু কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটলেই সুজাতার মুড অফ হয়ে যায়।

এরপর শুতে-না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লেন জ্ঞানব্রত। যেন ট্যাবলেটের ঘুম তাঁর জন্য জানলার বাইরে অপেক্ষা করছিল।

পরদিন সকালবেলা জানা গেল শশীকান্ত বাড়ির গেটের বাইরের সিঁড়িতে বসে ঘুমোচ্ছে।

জ্ঞানব্রত নিজেই যথেষ্ট ভোরে ওঠেন কিন্তু তাঁর আগেই রঘু দেখতে পেয়েছে। খবর পেয়ে জ্ঞানব্রত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই শশীকান্ত ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ কচলাতে লাগলো।

—কী ব্যাপার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন?

—আমি হারায় নাই স্যার, আমারে যারা পেঁছাতে এসেছিল...

—তারা কারা?

—ব্যাণ্ডেলে গেছিলাম স্যার, একটা ফাংশান ছিল। আসরে গাইতে দিল রাত এগারোটার পর। দুইখানা গানের পর পাবলিক বললো, আরও চাই—আরও চাই। গাইলাম আরও তিনখানা।

—বাঃ, ভালো কথা। ব্যাণ্ডেলে ফাংশান করতে গিয়েছিলে তো সে কথা এ বাড়িতে কাউকে বলে যাওনি কেন?

—দুপুরে রেডিও স্টেশনে গেলাম। সেখানে বিমানদা বললেন, ব্যাণ্ডেলে একটা ফাংশান আছে, যাবে? বোম্বাইয়ের একজন আর্টিষ্ট আসে নাই। ওরা সেইজন্য তিন চারজন একস্ট্রা লোকাল আর্টিষ্ট

চেয়েছে। যাবে তো এক্ষুনি চলো, একশো টাকা পাবে। তা স্যার, একশো টাকা রেট তো আমারে আগে কেউ দেয় নাই, তাই রাজি হয়ে গেলাম। পাবলিক খুব সাপোর্ট দিচ্ছে স্যার, আমারে থামতেই দেয় না! ঐ গানটা গাইলাম, ষোলো জন বোম্বেটে···

—ঠিক আছে। বাড়ির ভেতরে এস, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

—আপনি রাগ করছেন, স্যার ?

—না। আমাকে স্যার বলে ডেকো না।

—কী বলবো ?

-ইয়ে, শুধু দাদা বলতে পারো।

এরপর শশীকান্তের জন্য অন্য ব্যবস্থা হলো। দোতলার সুসজ্জিত গেস্ট রুমটির বদলে তাকে পাঠানো হলো একতলার সাদা-মাটা একটি ঘরে। সেখানে সে বেশী স্বস্তি পাবে। ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে, ইচ্ছে করলেসেখানে সে তার গানের রেওয়াজও করতে পারে। তাতে ওপর তলায় লোকেদের কোনো ব্যাঘাত হবে না। তার খাবারও পাঠিয়ে দেওয়া হবে নিচে।

এসব সুজাতারই ব্যবস্থাপনা।

খাবার টেবিলে বসে জ্ঞানব্রত বললেন, তাহলে শনিবারেই পুরীর হোটেল বুক করছি। শচীনকে বলে দিচ্ছি, আজই টিকিট কেটে ফেলবে। ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্লেনে যাবে, না ট্রেনে ?

সুজাতা বললো, ট্রেনেই ভাল। এক রাত্রিরই তো ব্যাপার। ওখানে গাড়ি পাওয়া যাবে তো ?

—হ্যাঁ, টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি ভাড়া করলে হবে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় ঘুম-চোখে উস্কো-খুস্কো চুলে এসে হাজির হলো উজ্জয়িনী। টেবিলে বসেই বললো, আমার দুধটা দিয়ে দাও আমি আজ তাড়াতাড়ি বেরুবো।

সুজাতা বললো, খুসি, এই শনিবার আমরা পুরী যাচ্ছি।

উজ্জয়িনী যেন আকাশ থেকে পড়লো। সারা মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে বললো, পুরী ? এখন ? তোমাদের কি মাথা খারাপ ?

—কেন ?

—গত বছর মনে নেই ? সর্বক্ষণ বৃষ্টি।

—তা বলে কি এবারেও বৃষ্টি হবে ?

—নিশ্চয়ই হবে। দেখছো না, এখানে এরই মধ্যে দু'একদিন বৃষ্টি হয়ে গেলো !

—তা হোক না। বৃষ্টির মধ্যেও সমুদ্র দেখতে কত ভালো লাগে। ইচ্ছে হলে আমরা পুরীর বদলে কোনারকে গিয়েও থাকতে পারি।

—তোমাদের ভালো লাগে তোমরা যাও।

—তুই যাবি না ?

—ইম্‌পসিবল ! আমি কলকাতা ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারবো না।

—কেন, তোর এমন কি কাজকর্ম আছে, শুনি !

—এই শনিবার দিন পারমিতার জন্মদিনের পার্টি। আমরা অনেক মজা করবো, কত দিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি।

—ঠিক আছে, আমরা তা হলে শনিবারের বদলে রবিবার যাবো।

—রোববার থেকে আমাদের নাটকের রিহার্সাল। আমরা মিড সামার লাইট্‌স ড্রিম করছি।

—তা হলে আমরা যাবো, তুই যাবি না ?

—তোমরা কি আমায় জিজ্ঞেস করে যাওয়া ঠিক করেছো ? আমার সুবিধে অসুবিধে কিছু আছে কিনা, তা একবারও ভেবে দেখবে না ?

জ্ঞানব্রত চুপ করে আছেন। মেয়ে বড় হয়েছে, তার একটা নিজস্ব মতামত তো থাকবেই। বাবা-মা যখন যেখানে যেতে বলবে, তাতে রাজি হবে কেন ?

উজ্জয়িনীর ওপর জোর করেও কোনো লাভ নেই। দারুণ জেদী মেয়ে।

মা ও মেয়েতে আরও কিছুক্ষণ উত্তর প্রত্যুত্তর চলবার পর জ্ঞানব্রত বাধা দিয়ে বললেন, থাক ও যদি যেতে না চায়, ও থাক।

—তা বলে বাড়িতে ও একা থাকবে?

উজ্জয়িনী এবার ফোঁস করে উঠে বললেন, হোয়াট ডু-য়ু মীন একা? আমি কি একা থাকলে ভূতের ভয় পাবো?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো উজ্জয়িনী একাই থাকবে। পুরীতে যাবে শুধু স্বামী স্ত্রী। জ্ঞানব্রতর ক্ষীণ আশা ছিল, যদি সুজাতা পুরো ব্যাপারটাই ক্যানসেল করে দেয়। কেননা, পুরীতে এখন বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে তাঁরও নেই। কিন্তু সুজাতা যাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অফিসে গিয়েই হোটেলের বুকিং এবং টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেললেন জ্ঞানব্রত। তারপর কাজে ডুবে গেলেন।

নিজে কিছুদিন তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন, আবার বাইরে যাচ্ছেন, মাঝখানে অনেকগুলো কাজ সেরে রাখতে হবে।

দু'দিন বাদে শেষ বিকেলে একটা টেলিফোন পেলেন জ্ঞানব্রত।

—আমি এলা বলছি। নাম শুনে চিনতে পারছেন তো?

—হ্যাঁ।

—আপনি আজ খুব ব্যস্ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ব্যস্তই বলা যায়।

—তা হলে আমি যাবো না? আমার ইচ্ছে ছিল আপনার কাছে গিয়ে নেমন্তন্ন করার। টেলিফোনেই বলবো?

মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞানব্রত চিন্তা করলেন, কিসের নেমন্তন্ন? বিয়ের? এরই মধ্যে মেয়েটি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে! আশ্চর্য!

—হ্যাঁ বলুন, মানে, ইয়ে বলো…

—কাল সন্ধেবেলা আপনি ফ্রি আছেন তো? না থাকলেও আপনাকে সময় করতেই হবে।

—কী ব্যাপার?

—আমার এখানে একটা ছোট্ট ঘরোয়া গান-বাজনার আসর

কালকে। আপনার আসা চাই। আমি কিন্তু কোনো রকম আপত্তি শুনব না। আসতে হবেই।

জ্ঞানব্রত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছে না। এই মেয়েটি যেন তাঁকে ক্রমশই জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। সামান্য একটা ছোট্ট ঘরে থাকে মেয়েটি, সেখানে গান বাজনার আসর? এই মেয়েটির সব কিছুই যেন অদ্ভুত।

—আপনি কিছু বলছেন না যে, হ্যালো! হ্যালো!

—আমার পক্ষে তো কাল যাওয়া সম্ভব নয়। একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—সন্ধে বেলাতেও কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট? হি হি হি! কতক্ষণ লাগবে? আপনি একটু দেরি করে আসুন, কোনো অসুবিধাই নেই।

—একটু নয়, অনেক দেরি হবে।

—কতক্ষণ, ন'টা দশটা। তার পরেও অন্তত আসুন একটু-ক্ষণের জন্য!

দশটার পরেও একটি কুমারী মেয়ে তার বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করছে। জ্ঞানব্রত এসব জীবনে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

তিনি কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বললেন, না, আমার পক্ষে কোনো-ক্রমেই সম্ভব নয়। দুঃখিত।

আর কিছু শোনার আগেই তিনি রিসিভার রেখে দিলেন।

এই মেয়েটিকে আর একটুও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। একে একেবারে মুছে ফেলতে হবে মন থেকে।

কাজ শেষ করার পর যথারীতি বাড়ী ফিরে তিনি একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেন। আবার কি ব্লাড প্রেসার বেড়েছে? তাঁর এক বন্ধু তাঁর চিকিৎসক। তাঁর কাছে একবার যাবেন নাকি?

সারাদিন প্যাচপেচে গরম গেছে। বাথরুমে ঢুকতে গিয়েও তিনি ঘেমে গেলেন। ইচ্ছে করছে সাঁতার কাটতে। ডাক্তারও বলেছিলেন অবগাহন স্নানে ব্লাড প্রেসারের উপকার হয়।

গাড়ি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়ে চলে এলেন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে। এক সময় এখানে তিনি নিয়মিতই আসতেন। হার্টের গণ্ডগোলটার পর আর আসা হয় না।

আজ ইচ্ছে করছে দু-এক বোতল বীয়ার পান করতে। এই গরমে ভালো লাগবে। কিংবা অনেকখানি বরফ দিয়ে গিমলেট। কিন্তু জ্ঞানব্রত সে ইচ্ছেটা দমন করলেন। তাঁর এক বন্ধু বোম্বাইতে তিন পেগ জিন খেয়ে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। সুইমিং পুলের মধ্যেই তার হার্ট অ্যাটাক হয় চিকিৎসারও সুযোগ পায়নি।

নীল রঙের পরিস্কার জল। তলার দিকটা বেশ ঠাণ্ডা। অন্য যারা সাঁতার কাটছে তারা প্রায় সবাই সাহেব-মেম। ভারতীয়রা এই ক্লাবের সভ্য হয় বটে। কিন্তু প্রায় কেউ জলে নামে না, জলের ধারে টেবিল নিয়ে বসে মদ খায় আর আড়চোখে অর্ধনগ্ন মেমদের দেখে।

আপন মনে সাঁতার কাটতে কাটতে জ্ঞানব্রতর হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সাঁতার শিখেছেন গ্রামের পুকুরে। কুষ্টিয়ার কুমারখালী গ্রামে। মামা বাড়িতে তাঁর সেজো মামা ন'বছর বয়স্ক জ্ঞানব্রতকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন পুকুরের মধ্যে। আকু-পাকু করতে করতে ডুবে যাবার ঠিক আগে সেজো মামা এসে ধরে ফেলতেন। এইভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে যায়।

এসব মনে পড়ে নি তো এতদিন! ক্যালকাটা ক্লাবের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে এসে এর আগে কোনোদিন তাঁর গ্রামের পুকুরের কথা মনে পড়েনি। শশীকান্তর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই···। কিন্তু এর মধ্যে একদিনও তো শশীকান্তর সঙ্গে গল্প করা হলো না, কিংবা শোনা হলো না তার গান।

খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে জ্ঞানব্রত ওপরে উঠে বসলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামবেন। জল খুব ভালো লাগছে আজ।

হঠাৎ পুলের ডান পাশের দিকে চোখ চলে গেল তাঁর, একজন নারীর বাহু ধরে এগিয়ে আসছে একজন দীর্ঘ চেহারার পুরুষ। রেডিওর সেই পি. সি. বড়ুয়া আর এলা। ওরা কোনো খালি টেবিল খুঁজছে।

জ্ঞানব্রত চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

সুইমিং পুলের রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উঠে এলেন জ্ঞানব্রত। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এলা কিংবা বড়ুয়া তাকে দেখতে পায় নি। জলের ধারে একটা টেবিলে বসে কী একটা কথায় যেন ওরা দু'জনেই হাসছে।

জ্ঞানব্রত চলে গেলেন পোশাক বদলাবার ঘরে। আগে গা মাথা মুছলেন ভালো করে। তারপর দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। নিজের মুখটা এত অচেনা লাগছে কেন? কেন তিনি একটু একটু কাঁপছেন? তাঁর ঈর্ষা হয়েছে? এই জিনিষটা তো তাঁর কোনদিন ছিল না। এলাকে তো তিনি এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলেন।

পোশাক পরে নিয়ে বাইরে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর এখন চলে যাওয়া উচিত। ওরা গল্প করছে করুক। এর মধ্যে তিনি নানান লোকের কাছে শুনেছেন যে ঐ বড়ুয়ার খুব মেয়ে-বাতিক আছে। কোনো সুন্দরী মেয়ে পেলে ছাড়ে না।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন! কিন্তু একটা প্রবল চুম্বক যেন তাঁকে টানছে পেছন থেকে। খুব ইচ্ছে করছে আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখতে তবু তিনি শক্তভাবে হাঁটতে লাগলেন। তার পিঠে কার ছোঁয়া লাগতেই তিনি চমকে উঠে বললেন, কে?

—আপনি আমাদের দেখতে পেয়েও চলে যাচ্ছেন যে?

এলার মুখখানিতে কী চমৎকার সুস্বাস্থ্যের তাজা ভাব। কলঙ্কহীন মসৃণ, নিষ্পাপ মুখ। জ্ঞানব্রত যেন একটি বৃষ্টিভেজা সদ্য ফোটা ফুল দেখছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না।

—আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

জ্ঞানব্রত ভাবলেন, এই মেয়েটি প্রায় তাঁর নিজের মেয়ের

বয়েসী। কিন্তু উজ্জয়িনীর তুলনায় কত বেশী অভিজ্ঞ। মুখখানা যত নিষ্পাপ দেখায়। মোটেই তত নিষ্পাপ নয়। যার তার সঙ্গে প্রকাশ্য জায়গায় মদ খেতে যায়। গায়িকা হিসেবে নাম কেনার জন্য পি. সি. বড়ুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পুরুষ মানুষদের দিকে এমনভাবে তাকায় যাতে সরলতার সঙ্গে মিশে থাকে লাস্য। ক্যাল-কাটা ক্লাবে প্রথম আলাপের দিন জ্ঞানব্রতর দিকেও এলা এইভাবে তাকিয়ে ছিল।

অথবা, এসব দোষের নয়। জ্ঞানব্রত পুরনো পন্থী? ব্যবসায় জগতে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে পৃথিবী কতটা বদলে গেছে, তা তিনি জানেন না?

অনেককিছু বদলালেও ভালোবাসা, লোভ, দুঃখ, ঈর্ষা এসব বদলায় না। জ্ঞানব্রতর বুকের মধ্যে যে একটা জ্বালাজ্বালা ভাব, সেটা ঈর্ষা ছাড়া আর কী।

তিনি ঠাণ্ডাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর?

এলা বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে একটু বসবেন না?

—আমি একটু সাঁতার কাটতে এসেছিলুম।

—একটু বসুন। এক্ষুণি চলে যাবেন!

—হ্যাঁ, যেতে হবে।

—আপনি আমায় দেখলেই এড়িয়েযেতে চানকেন, বলুন তো?

—ইয়ে…তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাওয়ার কি কোনো কথা ছিল? সুতরাং এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে কি করে? চলি।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না, এবার বেশ গট গট করে বেরিয়ে গেলেন জ্ঞানব্রত। এলাকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরে তিনি বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন।

একটু আগে তাঁর মনে হচ্ছিল, এলা মেয়েটি তাকে ঠকিয়েছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে পি. সি. বড়ুয়ার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, সুইমিং ক্লাবে লাঞ্চ খেতে এসেছে। এবার তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এ রকম কোনো মেয়ের সঙ্গে বাজে খরচ করার

মতন সময় তাঁর নেই।

কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনের ভাব বদলে গেল আবার।

সুইমিং ক্লাবে প্রথমে বড়ুয়ার সঙ্গে এলাকে দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়েছিল, এটা অস্বীকার করতে পারেন না। তারপর এলা তাঁকে ডাকতে এলেও তিনি ওদের সঙ্গে বসতে রাজি হন নি। এতে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। তা হলে এখন আবার কষ্ট হচ্ছে কেন? অফিসে কোনো কাজে মন বসছে না। একটু আগে একজন সাপ্লায়ার এসে কী বলে গেল তা তিনি ভাল করে শোনেনেই নি।

এলাকে তিনি অপমান করেছেন। এরকম তো তাঁর স্বভাব নয়। কারুর সঙ্গেই তিনি রূঢ় ব্যবহার করেন না। বিশেষত একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে এ রকম কেন হলো?

সন্ধ্যের পর তার ড্রাইভার ছুটি চাইলো। দেশ থেকে তার কোন আত্মীয় আসবে। তাকে আনতে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। সাহেবকে বাড়ী পেঁৗছে দেবার পর বাকি সন্ধ্যেটা ছুটি চায়।

অফিস থেকে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিলেন জ্ঞানব্রত। অনেকদিন পর তিনি নিজে আজ গাড়ি চালাবেন। বুকে ব্যথা হবার পর থেকে ডাক্তারের উপদেশে তিনি গাড়ি চালানো বন্ধ করে ছিলেন।

এ কি, এ তিনি কোথায় যাচ্ছেন? নিজের ব্যবহারেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন জ্ঞানব্রত। মনের কোন গভীর জায়গায় এইসব ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে? এদিকে এলার বাড়ি। এলা একদিন খুব অনুরোধ করছিল তার বাড়িতে কিছুক্ষণ বসবার জন্য।

প্রথম আলাপে এলা বলেছিল, সে ওয়ার্কিং গার্ল'স হোস্টেলে থাকে। তারপর সে আলাদা ফ্ল্যাটের কথা উল্লেখ করেছিল। এলা তো চাকরি করে না। এ সব খরচ সে চালায় কি করে? না, না, মেয়েটিকে কোনো ক্রমেই নষ্ট হতে দেওয়া চলেনা। তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনী যদি একটা সুন্দর সুস্থ জীবন পায় তা হলে এলাই বা পাবে না কেন?

এলার ঘরে গানের আওয়াজ আসছে। যদি ওখানে বড়ুয়া বসে

থাকে? বড়ুয়ার মতলব ভালো না, এলাকে সাবধান করে দিতে হবে। বড়ুয়াকেও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যে কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে এরকম ব্যবহার করতে পারবে না।

দরজা খুলে এলা অবাক হয়ে গেল।

না, আর কেউ নেই, এলা একা একাই বসে গানের রেওয়াজ করছিল। এটা এলার দিদির ফ্ল্যাট। দিদি-জামাইবাবু বাইরে গেছেন বলে এলা কেয়ার টেকার।

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন অনেক কিছু বলবেন এলাকে। তিনি শুধু বললেন, এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলুম।

—মোটেই না। শুধু ভাবছি আমার এত সৌভাগ্যের কারণটা কী?

—তুমি গান গাইছিলে, তাই গাও, আমি শুনি।

—আপনি একদিন কী একটা ফোক্ সঙ-এর কথা বলছিলেন। আমি কিন্তু ফোক সঙ জানি না।

—তুমি যা জানো, তাই গাও।

হারমোনিয়াম নিয়ে এলা নিঃসংকোচে গান ধরলো। রবীন্দ্র সঙ্গীত: মধুর তোমার শেষ যে না পাই—।

এ গানটা জ্ঞানব্রত অনেকবার শুনেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, রবীন্দ্র সঙ্গীত সব পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু এই গানটা তো আবার নতুন করে ভালো লাগলো। এলার গলাটা সেরকম আহামরি কিছু না হলেও সুশ্রাব্য। চর্চা করলে ও একদিন নাম করতে পারবে।

—বাঃ, বেশ ভাল হয়েছে!

—আমি আপনার প্রশংসায় বিশ্বাস করি না। আপনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

—না, না।

—আমি ঠিক বুঝেছি। আপনি সেই ফোক সঙটার কথাই ভাবছিলেন নিশ্চয়ই। কি সেই গানটা?

—শহরে ষোলজন বোম্বেটে করিয়ে পাগল পারা…লালন

ফকিরের গান।

—এই গানটার বিশেষত্ব কী ?

—সে রকম কিছুই না। আমি যে গান বাজনার খুব একটা ভক্ত, তাও না। তবু, রেডিওতে একদিন ওই গানটা শুনে আমি যেন কী রকম হয়ে গেলাম। আসলে আমার একটা হারিয়ে যাওয়া বাল্যকাল আছে। কয়েকটা বছরের কথা আমার কিছুই মনে পড়ে না। এই গানটা শুনে একটু একটু মনে পড়লো…কুষ্টিয়ায় থাকবার সময় একজন ফকিরের মুখে আমি এই গানটা শুনতাম…আমার দাদা মশাইয়ের কাছে আসতেন সে ফকির…। মনে হয় যেন একটু একটু করে সব মনে পড়বে এবার…। অবশ্য এত সব মনে পড়া ভালো নয়।

—কেন ভালো নয় ?

—মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ইদানীং, জীবনটা যদি আবার নতুন করে শুরু করা যেত !

—এ রকম চিন্তা আপনার মাথায় কে ঢোকালো ? আপনি একজন সাকসেসফুল মানুষ, কোনোদিকেই অভাব নেই।

—তবু তো মনে হয়।

—আপনার বাড়িতে একজন গায়ককে এনে রেখেছেন, তাই না?

– হ্যাঁ…তুমি কী করে জানলে ?

এলা এবার চোখ টিপে দুষ্টু মেয়ের মতন হাসলো। তারপর বললো, জানি…খবর রাখতে হয়…আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

—আমার তো কোনো গোপন কথা নেই।

—সেই গায়কের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন না। আমি তা হলে কয়েকটা ফোক সঙ শিখে নিতে পারি। আপনি যখন ঐসব গান এত ভালোবাসেন।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে জ্ঞানব্রত বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো। শোনো আমি সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি। তুমি আজে-

বাজে লোকদের সঙ্গে ঘুরো না। তুমি মন দিয়ে গান শেখো। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আমি যদি মাসে মাসে তোমাকে ধরো হাজার দেড়েক টাকা দিই, তাতে তোমার খরচ চলে যাবে?

—অর্থাৎ আপনি আমাকে রক্ষিতা রাখতে চান?

কথাটা ঠিক একটা বুলেটের মতই জ্ঞানব্রতর বুকে লাগলো। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

—তুমি, তুমি আমাকে এই রকম কথা বললে।

—আপনার কথার কি এরকম মানে হয় না? আপনি শুধু শুধু আমাকে প্রত্যেক মাসে অত টাকা দেবেন কেন?

—মানুষ কি মানুষকে সাহায্য করে না?

—এদেশে কি গরীব গায়কের অভাব আছে? আপনি আমায় সাহায্য করতে চাইছেন···আমি একটা মেয়ে বলেই তো? তা ছাড়া বৌদি কি ভাববেন?

—বৌদি?

—আপনার স্ত্রী···তিনি যদি জানতে পারেন যে আমার মতন এক মেয়েকে আপনি প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা দিচ্ছেন, তা হলে তিনি, ঐ আমি যা বললুম, ঠিক সেই কথাই ভাববেন।

একটা বিমর্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্ঞানব্রত বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আমায় ক্ষমা করো।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই এলা তাঁর কাছে এসে বললো, আপনার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, আপনি মানুষটা খুবই ভালো। সত্যি-কারের ভালো।

—আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি।

যেন জ্ঞানব্রতই বয়েসে অনেক ছোট এইভাবে এলা গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললো, তা আমি ঠিকই বুঝেছি। আপনি মনে দুঃখ পেলেন নাকি?

জ্ঞানব্রত আর কিছু না বলে এলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি যা ভাবছেন, আমার অবস্থা ততটা খারাপ নয়। আমার টাকা পয়সার কিছু ব্যবস্থা আছে। আমার বাবা রেখে গেছেন। তবে যে যেমন মনে করে, মেয়েদের একটা বয়স হলেই বিয়ে করে সংসার করা উচিত, সেইটাই সুখী জীবন, আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি গান বাজনা নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে মিলবো, ইচ্ছে না হলে মিলবো না।

—আমি যাই ?

—কেন ? হঠাৎ উঠে পড়লেন যে।

জ্ঞানব্রতর একটা হাত নিয়ে এলা নিজের গালে ছুঁইয়ে বললো, বুঝেছি আমার ও কথাটার জন্য আপনি আঘাত পেয়েছেন। আমি কিন্তু মজা করে বলেছি।

মজা ? কোনো মেয়ে নিজের সম্পর্কে এরকম একটা শব্দ প্রয়োগ করে মজা করতে পারে ? জ্ঞানব্রতর সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

এরপর তিনি যা করলেন, সেরকম কিছু করবার কথা একটু আগেও তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

এলা এত কাছে, তার শরীরের উষ্ণতা, তার সান্নিধ্যের ঘ্রাণ যেন জ্ঞানব্রতকে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দিল। তিনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন এলাকে।

এলা একটুও আপত্তি করলো না। পাখি যেমন তার বাসায় গিয়ে বসে সেইরকমভাবে এলা জ্ঞানব্রতর বুকের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত রইলো।

জ্ঞানব্রত যেন অন্য মানুষ। তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমায় একটু আদর করি ?

এলা উঁচু করলো তার মুখটা। জ্ঞানব্রত তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতেই এলা বার করলো তার জিভ। অর্থাৎ চুম্বনটা যেন দায়সারা কিংবা সংক্ষিপ্ত না হয়।

সেই সময়টাতেও জ্ঞানব্রত এ কথা চিন্তা না করে পারলেন না

যে তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীকেও এ রকম একজন বয়স্ক লোক জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারে। উজ্জয়িনীও কি এলার মতন এত সব জানে! পি. সি বড়ুয়াকে তিনি মনে মনে নিন্দে করছিলেন, বড়ুয়া সুযোগ সন্ধানী। কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই···। তিনিও কি নিরালায় সুযোগ নিয়ে এলাকে···

তক্ষুণি জ্ঞানব্রত নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছে।

এরপর দু'দিন মন থেকে সমস্ত অন্য রকম চিন্তা বাদ দিয়ে জ্ঞানব্রত শুধু কোম্পানীর কাজে মেতে রইলেন। যেন তিনি নিজেকে শাস্তি দিতে চান।

কিন্তু তাঁর পুরী যাওয়া হলো না।

তাঁর কারখানায় দুটি ইউনিয়ন। এর মধ্যে যে ইউনিয়নটি বেশী শক্তিশালী, তারা হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন ধর্মঘটের নোটিশ দিল। এ সময় জ্ঞানব্রতর বাইরে যাওয়া চলে না। অবস্থা এখনো হাতের বাইরে চলে যায় নি। আপোষ আলোচনায় মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সুজাতা তৈরী হয়েই আছে। তাকে নিরাশ করা যায় না। জ্ঞানব্রত নিজেই প্রস্তাব দিলেন, সুজাতা একাই চলে যাক। হোটেল তো বুক করাই আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। যদি কয়েক-দিনের মধ্যে মিটে যায়, তাহলে জ্ঞানব্রত চলে যাবেন।

সুজাতা বললো, তাই যাই। দীপ্তি ফোন করেছিল, ওরাও এই শনিবারে পুরী যাচ্ছে। ঐ একই হোটেলে উঠবে।

দীপ্তির স্বামী মনীশ তালুকদার সুজাতাকে ছেলেবেলা থেকে চেনে। জ্ঞানব্রত পরে জানতে পেরেছিলেন যে বিলেতে ঐ মনীশ ছিল সুজাতার এক নম্বর প্রেমিক। অবশ্য তখন মনীশ ছিল মৌমাছি স্বভাবের, বিয়ের দিকে মন ছিল না। এই নিয়ে জ্ঞানব্রত কতবার মৃদু ঠাট্টা করেছেন সুজাতাকে।

—বেশ তো, ভালোই হবে তা হলে। ওদের সঙ্গে তুমি বেড়াতে

টেড়াতে পারতে।

সুজাতা চলে যাবার দু'দিন বাদে এলা টেলিফোন করে জানালো, আপনি তো আলাপ করিয়ে দিলেন না। আমি কিন্তু নিজেই আলাপ করে নিয়েছি শশীকান্ত দাসের সঙ্গে।

জ্ঞানব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আলাপ হলো?

—রেডিও স্টেশনে। চমৎকার মানুষ। এত সরল আর অনেক গানের স্টক।

—হুঁ।

—উনি কলকাতা শহরের কিছুই চেনেন না। কাল আমি ওঁকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা দেখিয়ে আনলুম।

—ও!

—আমি কিন্তু ঐ 'শহরে ষোলজন বোম্বেটে' গানটার প্রথম কয়েক লাইন এর মধ্যে তুলে নিয়েছি।

—আচ্ছা?

জ্ঞানব্রত ভেবেছিলেন এলার সঙ্গে তিনি কোনদিন দেখা করবেন না। কিন্তু টেলিফোনটা ছাড়বার পরই তাঁর মনে হলো, কই এলা তো একবারও বললো না, আবার কবে দেখা হবে, কিংবা আমাদের বাড়িতে আসবেন!

একই সঙ্গে কাজের ব্যস্ততা আর অন্যমনস্কতা। কাজ তো করতেই হবে, অথচ প্রত্যেক দিন জ্ঞানব্রতর মনে পড়ছে এলার কথা। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে এলার বাড়িতে। মেয়েটা কি তাঁকে জাদু করেছে? এতগুলো বছরে জ্ঞানব্রতর কখনো পদস্খলন হয় নি, আর এখন ঐ একটি মেয়ের জন্য! সুজাতার কাছে তিনি অপরাধ করছেন।

পুরীতে দীপ্তির চোখে ধুলো দিয়ে মনীশ কি সুজাতার সঙ্গে গোপন ঘনিষ্ঠতা করতে চাইবে না? এ সুযোগ কি মনীশ ছাড়বে? দীপ্তির চেহারাটা হঠাৎ বুড়িয়ে গেছে, সেই তুলনায় সুজাতার শরীরের বাঁধুনি এখনো কত সুন্দর।

সুজাতা কি আগেই জানতো যে মনীশরা এই সময় পুরীতে যাবে! সেই জন্যই ওর পুরীতে যাওয়ার এত উৎসাহ?

শশীকান্তর সঙ্গে বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি জ্ঞানব্রতর। একই বাড়িতে থাকলেও সুযোগ হয় না। দেখা হলো রাস্তায়।

জ্ঞানব্রত কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সিতে এলা আর শশীকান্ত। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, শশীকান্তের চুল পরিপাটি ভাবে আঁচড়ানো, এলার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সেই হাসি আর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। জ্ঞানব্রত পরিষ্কার দেখতে পেলেন শশীকান্তের চোখে-মুখে এলার জাদু।

তাঁর বুকের মধ্যে দুক্ দুক্ শব্দ হতে লাগলো। কঠিন হলো চোয়াল। শশীকান্ত তাঁর আশ্রিত, সামান্য একটা গ্রাম্য লোক, তার এতটা বাড়াবাড়ি! কোথায় যাচ্ছে এখন? এই দিকেই এলার বাড়ি। শশীকান্তর উচিত ছিল না একবার জ্ঞানব্রতর কাছ থেকে অনুমতি নেবার?

ট্যাক্সিটা এখনো চোখের আড়ালে যায় নি, জ্ঞানব্রত তাঁর ড্রাই-ভারকে বললেন, সোজা চলো।

যেমন ভাবেই হোক এলাকে রক্ষা করতে হবে। যার তার সঙ্গে এমন ভাবে এলার মেলামেশা কোনোক্রমেই চলতে পারে না। এলার ফাঁকা ফ্ল্যাটে এই সময় শশীকান্তকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? গান শেখার জন্য—এই দুপুরবেলা? শশীকান্ত গ্রামের লোক। এলার মতন মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশার অভ্যেস নেই, মাথা ঠিক রাখতে পারবে না!

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, এবার কোন দিকে?

এক মুহূর্তের জন্য যেন জ্ঞানব্রতর রক্ত চলাচল থেমে গেল। 'কোন দিকে' কথাটা যেন একেবারে নাড়িয়ে দিল তাঁর চৈতন্য। এ তিনি কি করছেন? এলাকে শাসন করতে গেলে যদি আবার সে

একটা মর্মভেদী কথা ছুঁড়ে দেয়? সেদিন এলা বলেছিল, সে স্বাধীন থাকতে চায়। যার সঙ্গে খুশী তার সঙ্গে মিশবে···। এলা তো তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কারখানায় ইউনিয়নের সাথে তাঁর একটা গুরুতর বৈঠক বসবার কথা এখন, আর তিনি ছুটছেন একটা মেয়ের পেছনে।

পুরীতে মনীশ যদি সুজাতাকে···। মনীশ ঠিক নিভৃত সুযোগ করে নেবে, ও এখনও রীতিমতন প্লেবয় ধরনের। বিভিন্ন পার্টিতে তিনি দেখেছেন মনীশ পরস্ত্রীদের পিঠে হাত রাখে। কিন্তু সুজাতা কি রাজি হবে? তিনি যদি গোপনে এলার বাড়ীতে গিয়ে তাকে চুমু খেতে পারেন তা হলে সুজাতাই বা কেন··· উজ্জয়িনী কাল রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরেছে। এত রাত পর্যন্ত ও কোথায় থাকে, কার সঙ্গে মেশে। জ্ঞানব্রতরই মতন অন্য কোনো লোক যদি উজ্জয়িনীর মতন একটা অল্প বয়েসী মেয়ের মন জয় করতে চায়?

জ্ঞানব্রত একবার ভাবলেন। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এলাকে নিয়ে নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করলে হয় না?

তারপরেই ভাবলেন, না, না। ঐ ষোলজন বোম্বেটেকে সব কিছু লুটেপুটে নিতে দেওয়া হবে না। আটকাতে হবে। মাথা ঠিক রাখতে হবে।

তিনি কড়া গলায় ড্রাইভারকে বললেন, কোন দিকে আবার? রোজ যেদিকে যাই সেদিকে যাবো!

জীবনের পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে এসেছেন জ্ঞানব্রত। তাঁর সব রাস্তা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর অন্য কোনো দিকে ফেরা যাবে না।

—